সুনির্বাচিত গল্প

সুচিন্ত্য সরকার

নবসাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬২

মঞ্জু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রন্থসত্ত্ব সংরক্ষিত। পরিবেশক : নবসাহিত্য প্রকাশনী ১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি, কলি-৯ মুদ্রক : সোয়ান আর্ট প্রিন্টার্স, ১বি/২৮, দমদম রোড, কলি-২ প্রচ্ছদ : সু সরকার।

শ্রীসুচিন্ত্য সরকারের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। যে ছোট গল্পগুলি এই বইতে সংকলিত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। তাই বিভিন্ন সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পছন্দের ছাড়পত্র গল্পগুলি আগেই পেয়ে গেছে।

ছোটগল্প লেখা বেশ কঠিন কাজ। ছোটগল্পের আয় নটাই শুধু ছোট নয়, ঐ আয়তনের মধ্যে জীবনের একটি মুহূর্ত বা একটি বিশেষ ঘটনাকে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে গোটা মানুষের চরিত্রটাই ধরা পড়ে। ইদানীং গল্প বা কাহিনী এড়িয়ে ছোট গল্প লেখার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতা যা সৃষ্টি করছে সেটা আসলে রিপোর্টাজ। সুচিন্ত্য বাবুর গল্পগুলি সে ধাঁচের নয়। তিনি গল্প লিখতেই চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন স্বল্প পরিসরে অর্থবহ কাহিনী রচনার। কোনও চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে লেখক বক্তৃতা দিয়ে দিতে পারেন বা তার সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে পারেন; কিন্তু সেই চরিত্র তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন সে ঘটনার মধ্যে পড়বে। সেই ঘটনা থেকেই সৃষ্টি হবে কাহিনী। সেই কাহিনীতে বক্তৃতা না থাকলেও তার তাৎপর্য বুঝতে পাঠকের অসুবিধে হয় না। ঐখানেই ছোটগল্পের সার্থকতা। শুধু এ যুগের লেখক নন, প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুচিন্ত্য বাবুর গল্পের বিষয়বস্তু বিচিত্র হলেও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নির্বাচিত।

তাঁর গল্পে রয়েছে কৃষকের সংগ্রামের কাহিনী। সে সংগ্রামে কৃষকেরা সাময়িক পরাজয়ের দ্বারা হতাশ হয় না। পূর্ব দিগন্তে ভোরের সূর্যের রক্তিম আভায় তাদের মনে ভবিষ্যৎ বিজয়ের প্রেরণা আনে। ('ভোরের সূর্য লাল')।

‘তিতাস’ গল্পটি লেখা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায়। সে যুদ্ধে জয় হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু কী নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে তা দেখানো হয়েছে আমিরআলির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে।

‘নিঃসঙ্গ মন’টা একটা বৈপরিত্যের কাহিনী। স্মৃতিসুধায় সেই বৈপরিত্য সুন্দর রস সৃষ্টি করেছে।

‘অস্তিত্বের অপমৃত্যু’ গল্পে রোগগ্রস্থ তাহেরআলি মরে প্রমাণ করলো যে, তার একটা অস্তিত্ব ছিল। সেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তার স্ত্রী আমিনা এক লোভাতুর নরপশুর খপ্পরে গিয়ে পড়ে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে অব্যাহতি পায় না। কিন্তু তাহের-আলিকে বাঁচাবার উপযোগী অর্থ নিয়ে যখন সে ফিরলো তখন তাহের তার নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছে।

পরিবেশ বদল না হলে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তাই ‘পাঁচুর স্বপ্ন’ গল্পের পাঁচু যে স্বপ্ন দেখেছিল তা সহজেই ব্যর্থ হয়ে গেল ; তার ছেলে নারুকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোর স্বপ্ন অন্ততঃ একবার তো নষ্ট করে দিল বংশী।

এমনি করে কত স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায়। ঝুমরি আর জগুর ঘর বাঁধার স্বপ্নও একদিন ভেঙ্গে গেল (‘চেতনার রঙ্ নীল’)। আবার সে স্বপ্ন মানুষ বাস্তব করে তোলে সেই ‘সবুজ স্বপ্ন’ও যায় ভেঙ্গে।

এমনিভাবে সুচিন্ত্য বাবুর গল্পে ধরা পড়েছে সমাজের বিচিত্র নারী পুরুষ : সংগ্রামী কৃষক নেতাই, দেশপ্রেমিক যোদ্ধা আমিরআলী, বিপত্নীক মাধব মাষ্টার, সাঁওতাল মংরু, সাধ্বী নারী আমিনা, দিনমজুর পাঁচু, ধেনু সরদার, রাজমিস্ত্রীর কুলি ঝুমরি, কল্যাণী ট্রেনে কাটা পড়া চাঁপা বৌদি যে চাল বেচে তার স্বামীর ধর্মঘটের সংগ্রামকে সফল করতে চেয়েছিল, সবুজ স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছিল যে হারু প্রভৃতি।

সুচিন্ত্যবাবু সহজ ভাবে গল্প বলেন। কথায় চিত্র সৃষ্টি করতে পারেন সুন্দরভাবে। তাঁর গল্পগুলি চলমান জীবনের কাহিনী। এই জীবনের হাসি-কান্না সংগ্রাম-ব্যর্থতা সবই তাঁর গল্পে আছে। সেই

জন্যই গল্পের কাহিনীগুলি বাস্তব হয়েছে। বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর মুখের ভাষা চরিত্রানুসারী করা হয়েছে।

লেখক সহানুভূতিশীল, সমাজের নীচুতলার মানুষের সংগ্রামে আস্থাশীল। তাই তাঁর গল্পে আছে আশাবাদের সুর। এইটাই বড় কথা।

১১ এ, তিলজলা রোড

কলিকতা-৪৬

প্রভাতকুমার গোস্বামী

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে যে ক'জন তরুণ গল্পকার কলম ধরেছিলেন সুচিন্ত্য সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সংবেদনশীল সমাজ সচেতক গণমুখী কথাকার শ্রীসরকার শক্ত হাতে কলম ধরে সংগ্রামী মানুষের জীবন-কথা সপ্তাহিক বসুমতী, সত্যযুগ, যুগান্তর, যুবমানস, নক্ষত্র, অপরাজিত প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় সৃজনশীল শিল্পগুণ সম্পন্ন কথারূপকে উপস্থাপন করেছেন পাঠকদের দরবারে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী এই গল্প গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং পৃথীশ মজুমদার, সুমর জোয়ারদার, মনোরঞ্জন সরকার, বিকাশ মুখোপাধ্যায়, দুলাল গোস্বামী, অমল চক্রবর্ত্তী, বীরেন ঘোষ, সুধীর ঘোষ, সনন্দ রায়চৌধুরী, শ্যামল মৈত্র, অলক্তা চক্রবর্ত্তী, জিতেন চক্রবর্ত্তী, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, সুভাষ সাহা প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীদের অকৃপণ সহযোগিতার জন্য এই শুভ মুহূর্তে সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

—প্রকাশিকা

প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে

ভোরের সূর্য লাল / ৯
তিতাস / ১৭
নিঃসঙ্গ মন / ৩১
অস্তিত্বের অপমৃত্যু / ৩৮
পাঁচুর স্বপ্ন / ৪৮
চেতনার রঙ নীল / ৫৬
পশ্চাৎ ভূমি / ৬৩
নকুলের নগর দর্শন / ৭১
মান্নাদা / ৭৭
সবুজ স্বপ্ন / ৮৬
জ্বালা / ৯৮

ভোরের সূর্য লাল

মোরগের ডাক কানে যাওয়া মাত্র আর শুয়ে থাকতে পারে না পবন। হাড় কাঁপুনি শীতেও এই বুড়ো বয়সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। এটা পবনের চিরদিনের অভ্যেস। চিরকালটা সে এই সাত সকালে ওঠে। তারপরে মাথার কাছে বেড়ায় গুঁজে রাখা হুঁকোটা নামিয়ে, নিত্যকার মত পছন্দসই তামুক সাজায়। মাটির খোরায় রাখা তুষের আগুন থেকে চিমটে দিয়ে আগুন তুলে কল্কের মুখে রাখে। তারপর হুঁকোয় মুখ দিয়ে আমেজ মত টানতে থাকে। ফুড়ুক ফুড়ুক ধোঁয়া ছাড়ে। কানে মাথায় চাদর জড়িয়ে নেয়। বাঁশের খুঁটিতে পিঠটা ঠেকিয়ে হাঁটুর 'পরে থুতনিটা রেখে মৌজ করে তামুক টানে পবন।

বাইরে কুয়াশা জড়ান আবছা অন্ধকার একটু পাতলা মনে হয়, শিরীষ আর সুপারী গাছের শিরে শিরে ভোরের আভাস ফুটে ওঠে। কাক ডাকে—কা-কা করে। শুনতে পবনের ভাল লাগে। সে বাইরে তাকায়, ছানি পড়া চোখে ঝাপসা দেখে। বয়েস তিন কুড়ি পেরোলেও বুড়োর গতরে তাকৎ ছিল। তবে এই বছর দুয়েক হলো দেহটা ভেঙে পড়েছে। হাঁপের টানটা বেজায় বেড়েছে। হাঁপানীর আক্রমণে কাবু হয়ে গেছে পবন। নচেৎ পবন বেরাকে এই অবস্থায় কেউ দেখেনি কোনদিন। এই ত বছর কয়েক আগে জমির আলভাঙা নিয়ে ভীষণ গণ্ডগোল বেঁধেছিল। পবন একাই লাঠি চালিয়ে ঘায়েল করেছিল কয়েকটাকে। কিন্তু আজ কে একথা বিশ্বাস করবে? হুঁকো টানতে টানতে মাঝে মাঝে জোরে জোরে কেশে ওঠে পবন। সময় সময় টান ওঠে পড়ে। দম নিয়ে একটু সামলে নেয়। আবার হুঁকো টানতে থাকে। এতদিনের পুরনো অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনা সে। অনেক

চেষ্টা করেছে পবন। তবু ছাড়তে পারেনি। এখন আর চেষ্টা করবেনা। যা হয় হবে। নিজের জন্যে আর ভাবেনা পবন।

ছেলেটা লায়েক হয়ে উঠেছে। ঘাড়ে গর্দানায় জোয়ান। আর ভাবনা নেই। ক্ষেত-খামারে খাটতে পারলেই পেট চালাতে পারবে। তবে এতদিন নিজের জমি ছিল না—পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করত। দশ আনা ছ' আনা ভাগে যা সামান্য ফসল পেত তাতে বছরের তিনটে মাসও চলত না। তাই বাড়ি বাড়ি জন খেটে পেটের ভাত জোগান মুসকিল হত পবনের। কিন্তু এখন আর সে ভাবনা ভাবতে হবেনা।

এতদিনে মা লক্ষ্মী সত্যি সত্যিই কৃপা করেছেন। সোনার ফসলে আজ পবনের সারা উঠোন ভরে গেছে। আমন ধানের আঁটি একের পর এক সাজানো রয়েছে। দেখলে পবন তৃপ্তিতে দুচোখ জুড়িয়ে যায়। পবনের ছানি পড়া চোখ দুটো খুশির আমেজে ভরে ওঠে। নেতাই একাই একশ। ছেলেটার ক্ষ্যামতা আছে। পবনের শিথিল হাঁপধরা বুকখানা আশার আনন্দে ফুলে ফেঁপে ডবাট হয়ে ওঠে।

নেতাইটার বিয়ে দিতে হবে। সংসারটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে এবারে পালাতে চায় পবন। গগন মণ্ডল হাঁ করেই আছে। শুধু মুখের কথাটা ফেলতে যতক্ষণ। তবে হ্যাঁ। গগনের মেয়েটা সুন্দরী বটে। নেতাইয়ের সঙ্গে মানাবেও ভাল।

হুঁকো টানতে টানতে পবন এসব কথা ভাবছিল। তারপর হুঁকোটাকে বেড়ায় গুঁজে রাখে। দেহটাকে একটু নেড়েচেড়ে পা দুটো সোজা করতে চেষ্টা করে।

ভোরের পাখির দু'চারটে মিষ্টি ডাক কনকনে শীতের মধ্যেও শুনতে ভাল লাগে। পবন লাঠিতে ভর করে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে ঘর থেকে নামে। জমাট কুয়াশা এখনও পাতলা হয়নি। তবে আকাশের পূব দিকটা লালচে দেখায়। পবন দেখতে পায় সেই লালচে রঙটা কুয়াশার গায়ে ভর করে উঠোনের ধানের আঁটিগুলোর ওপর সোনার ছোপ ছড়িয়েছে। পবন এগিয়ে আসে। ধানের আঁটিগুলোর ওপর আদর

ভরা দরদ মেশানো হাত দুটো বোলাতে থাকে। দু'হাতের কোষে বিন্দু বিন্দু শিশিরের ফোঁটা সযত্নে ধরে। তারপর হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় আর বিড় বিড় করে কি যেন বলে—

নেতাইটা এখনও ফিরতেছে না। সারা রাত-ভর মাঠে ধান কেটেছে নেতাই। পবন জানে জোছনা ভরা রাত। তাই ধান কাটতে কোন অসুবিধা হয়নি। জোয়ান ছেলে—এ বয়সে সব সহ্য হয়। সেজন্যে ভাবেনা পবন। তবে ছেলেটা এখনও ফিরে আসতেছে না ক্যানে। একটা চাপা সন্দেহ জাগে।

পূবের আকাশটা আর একটু ফরসা ঠেকছে। ভরসা পায় পবন। নেতাই ত একলা নয়। ওদের বয়েসা আরও চার পাঁচটা ছেলে রয়েছে। সকলেই ওরা মাঠে ধান কাটছে। এই কদিন ধরেই মাঠে ধান কাটা চলছে। তালবান্দা গেরামের সকলের মুখেই হাসি ফুটেছে। তবে এই হাসি আনন্দের মূল যে লোকটা—সেই নারাণ মাস্টারের কথা পবনের বারে বারে মনে হতে থাকে। তাই আবার কপালে হাত ঠেকিয়ে মাস্টারের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—হেই ঠাকুর। আমাদের মাস্টারকে সুখে রেক।

এই তালবান্দা গ্রামের ইস্কুলের মাস্টার নারাণ চক্রবর্তী। এমন ভালমানুষটি আর হয় না। দিনরাত কেবল মানুষের জন্যে খেটে মরে লোকটা। নিজের কথা একবারও ভাবেনা। গ্রামের গরীব-দুখী, চাষী, কামার-কুমোর—এরা সবাই যেন মাষ্টারের আপনজন। এতখানি বয়েস হল। আজও বে-থা করল না। আর বোধ হয় করবেও না। বিয়ের কথা বললে মাস্টার হেসে বলে—আমায় মেয়ে দেবে কে? ঘরছাড়া বাউণ্ডুলের হাতে কেউ মেয়ে দেয় নাকি?

কিন্তু পবন ভাল করেই জানে নারাণ মাস্টার যে সে ঘরের ছেলে নয়। বড় ঘরের ছেলে। লেখাপড়া করেছে অনেকখানি। তিনটে না যেন চারটে পাশ। বাপ উঁচুদরের একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। এক উকিলের সোন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু মাস্টার

বাপের কথায় রাজী হয়নি। বরং বড়লোক বাপের সঙ্গে নিজের মতের অমিল হওয়ায় একদিন ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এই গেরামে। সেই থেকে পার্টির কাজ করে। আর এই গেরামের ইস্কুলে মাস্টারী করে সে। মাস্টারী তার ভাল লাগে। দরদ দিয়ে পড়ায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসে। নারাণ মাস্টার এই তালবান্দা গেরামে আসার পর থেকে গাঁয়ের অনেক উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাট সাঁকো—এমন কি কাঠের পুল। এই সব তৈরী, মেরামত, ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে লেখালেখি, তদ্‌বির-তালাপি করে সব করিয়ে নিয়েছে। গ্রামবাসী সকলের সুখে দুখে মাস্টার এগিয়ে আসে। সবাই তাকে ভালবাসে। ছেলে বুড়ো সবাই মাস্টারের কথায় ওঠা-বসা করে। বিশেষ করে নেতাই, যুগল, বলাই, রতন, উপেন, ভজন, শিবেন, রাজেন, গোষ্ঠ এরা সকলে মাস্টারেয় চেলা। তাইত নেতাইটার এতখানি সাহস বেড়েছে! অনেক শক্ত শক্ত কথা শিখেছে। নিজের সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারনা জন্মেছে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকারটুকু আদায় করে নিয়ে সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকার দাবী করতে শিখেছে। অবশ্য সেই অধিকার কারুর কৃপা ভিক্ষা নয়। মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকারের দাবী। আর সেটা জোর করে আদায় করতে হবে। প্রয়োজন হলে লড়াই করতে হবে। বাঁচার লড়াই। তাইত গাঁয়ের চাষীরা সবাই জোট বেধেছে। যাদের নিজস্ব জমি নেই। যারা বছরের পর বছর জোতদারদের জমিতে চাষ করে, অথবা বর্গা চাষ করে সামান্য ফসল পায়। যাতে বছরের তিন মাসেরও খোরাকী হয় না। তাও আবার মালিকের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

তালবান্দা গ্রামের চাষীরা এবছর সেই সব জমি দখল করেছে। জমি তাদের নিজেদের। তারা জমি চাষ করবে, নিজেরা ভোগ করবে। আর কাউকে ভাগ দেবেনা। তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে কেউ তাদের ঠকাতে পারবেনা। কোন জোতদারকে ফসলের ভাগ দেওয়া হবেনা। যে ফসল বুনতে তাদের গায়ের রক্ত জল হয়েছে, মাথার ঘাম পায়ে

পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টিতে গতর ভিজছে, সেই ফসলের মালিক তারা নিজেরা—এই চাষীরা।

নারাণ মাস্টার সত্যি কথা শিখিয়েছে। আজকে এই যে পবনের উঠোন ভর্তি ধান—এর মূলেও সেই নারাণ মাস্টার। মাস্টারের পরামর্শ মতই নেতাই, গোষ্ঠ, পরান, উপেন এরা সবাই মাঠের ধান ঘরে তুলেছে। তালবান্দা গ্রামের সব গেরস্থ চাষীর ওই এক কথা—

ধানরে ধান
ধানে বাঁচে মান।
ধানের তরে দিতে পারি
সবাই মোরা প্রাণ।

এই গানের সুরটা পবনের মনে হতেই তার বুকখানা আবার ফুলে ওঠে। অসম্ভব গর্ব বোধ করে সে।

এতক্ষণে আকাশটা আরো ফরসা হয়ে ওঠে। পবনের মেয়ে দুলি বাড়ির উঠোনে গোবর-ছড়া দেয়।

মেয়েটা ডাগর হয়ে উঠেছে। মা-মরা মেয়ে। ঘরের সব কাজকর্ম অতটুকু মেয়ের একার হাতে করতে হয়। বড্ড কষ্ট হয় মেয়েটার। নেতাইটার বে-থা হয়ে গেলে দুলির জন্যও ছেলে দেখতে হবে। মেয়ে সোমত্ত হয়ে উঠেছে। আর ঘরে রাখা যায়না।

পবনের মনে হাজার কথার ভিড় জমে উঠতে থাকে। সে দু'এক পা করে হাঁটতে হাঁটতে গরু ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। বাছুরটা বাঁধা না থাকলে সব দুধটুকু খেয়ে নেবে। তাই পবন লাঠি ভর করে গোয়াল ঘরের দিকে এগোয়। ঠিক এমন সময় দুলি ছুটে আসে—বাবাগো, শুনতে পাচ্ছ? হেই সি-ধারে মাঠ বরাবর হাঁকাহাঁকি, চ্যাঁচামেচি। দুলি ভয় পাওয়া গলায় কথাগুলো বলে।

পবন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে কয়েক পা এগিয়ে যায়। যে দিক থেকে গণ্ডগোলের শব্দ ভেসে আসছিল সে দিকে। তারপর কান খাঁড়া করে শুনতে চেষ্টা করে। কিন্তু হৈ—হৈ ছাড়া কিছুই কানে আসছেনা।

দুশ্চিন্তায় পড়ে পবন। নেতাইটা এখনো আসতেছে না মাঠের থে, তবে কী! মনটা অস্থির হয়ে ওঠে পবনের। কী যেন ভাবতে থাকে গোয়াল ঘরের চাতালে বসে।

গণ্ডগোলটা পবনের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসে। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—এই যে, সব ধান খামারে তুলেছে। পবনের ব্যাটা নেতাইটা বড় বাড় বেড়েছে। হারামজাদাকে উচিত শিক্ষা দেব, তবেই আমার নাম বেণীমাধব চৌধুরী।

'বেণীমাধব' নামটা কানে আসতেই পবনের হাঁপ ধরা বুকখানা হঠাৎ যেন ধড়াস করে ওঠে। ছানি পড়া চোখের পাতা বার বার কেঁপে ওঠে। পবনের মুখে অস্পষ্ট উচ্চারণ হয় বেণীমাধব বাবু, চৌধুরী বাড়ির বড়বাবু স্বয়ং এইয়েচেন। কী সব্বনাশ।

দুলি কাঁদতে কাঁদতে বলে—বাবা ওরা সব ধান নে যাচ্ছে।

—এ্যাঁ, কী বললি? সব ধান নে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, বাবা, ওঠোন থেকে ধানের আঁটিগুলো ওরা এক এক করে সব গরু গাড়ি বোঝাই করতেছে। কী হবে বাবা। ওরা আমাদের সব ধান নে যাবে?

—না, তা কক্ষনো হতে দেবনি। আমি বেঁচে থাইকতে আমার বাড়ি থেকে ওরা ধান নে যাবে?

বুড়ো পবন লাঠিতে সারা গায়ের শক্তি দিয়ে ভর করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের সামনে এসে বলে—এ্যাই, খবদ্দার। ধান নিতে পারবিনি। বেরো, বেইরে যা তোরা আমার বাড়ি থেকে।

পবন রাগে কাঁপতে থাকে। কুঁকড়ে যাওয়া দেহটা টান টান হয়ে ওঠে। ছানি-পড়া চোখ থেকে আগুন ছোটে।

কিন্তু পবনের ধমকানিতে কেউ ভয় পায় না। ওরা ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে গাড়ি বোঝাই করতে থাকে।

পবন আর সহ্য করতে পারে না। ওর ইচ্ছে হয়—এক্ষুনি হাতের লাঠিটার ঘায়ে ওদের এক একটাকে সাবাড় করে দেয়। কিন্তু সে শক্তি আজ আর নেই পবনের। তাই পবন নিরুপায়। ভাবতে থাকে নেতাইর কথা।

এতক্ষণে পবনের বাড়ির গণ্ডগোল শুনে গগন মণ্ডল, সাজাদ মিঞা, দয়াল মাঝি এরা সব এগিয়ে আসে। এদের দেখে পবনের সাহস বাড়ে। তাই সে তেড়ে ওঠে—আমার চোখের সামনে দে ওরা ধান লুটে নে যাবে? না। তা হতে পারে না। পবন যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। সে হাতের লাঠিটা উচিয়ে লাগায় এক ঘা। লাঠির ঘা খেয়ে মাথায় ধানের বোঝা নিয়ে পড়ে যায় লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ওদের দলের কে যেন পবনকে কষে মারে এক লাথি। পবন মুখ থুবড়ে বে-সামাল হয়ে পড়ে যায়।

ঠিক সেই সময় ছুটতে ছুটতে নেতাই এসে হাজির হয়। সঙ্গে রতন, ভজন, উপেন, আরো অনেকে।

জোতদার বেণীমাধব আর সাগরেতদের সঙ্গে পুলিশ দেখে নেতাই উত্তেজনায় আগুন হয়ে ওঠে। তার ওপর বুড়ো বাবাকে অমন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ওর মাথায় খুন চেপে যায়। নেতাই এক ছুটে ঘর থেকে একটা গাছকাটা বড় দা নিয়ে ওদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—আমার বুড়ো বাপকে তোরা খুন করিচিস। তোদের আমি জানে শেষ করে দেব। আয় শালারা কে আসবি আয়।

নেতাই তুবড়ি বাজির মত ফেটে পড়ে। রাগে দুঃখে আর শোকে সে নিজেকে সামলাতে পারেনা। দা-খানা নিয়ে বেণীমাধবের দলের লোকগুলোকে তাড়া করে যায়।

ওরা পালাতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নেতাই থমকে যায়। আর এক পা এগুলেই গুলি। কে যেন ধমক দিয়ে ওঠে।

নেতাই দেখতে পায়—তার চারধারে কয়েকজন পুলিশ তাকে লক্ষ্য

করে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে। একজন নেতাইয়ের হাত থেকে জোর করে দা-খানা কেড়ে নেয়। তারপর হাতে, কোমরে দড়ি বেঁধে ফেলে। আর একজন সেপাই পবনের দিকে এগিয়ে যায়। পবন সংজ্ঞাহীন। বেণীমাধব গলা চড়িয়ে বলে ওঠে থাক—ওই ঘাটের মড়াটাকে আর টানাটানি করে লাভ নেই। ওটা এখনই মরবে।

কথাগুলো শুনে নেতাই দারুণ ক্ষেপে ওঠে। সে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে আসতে চায়। বুড়ো বাপকে একবারটি শেষ দেখা দেখবার জন্যে, কিন্তু পারে না, পুলিশের বন্দুকের নলের মুখে সে নিরুপায়।

পবনের জ্ঞান যখন ফিরে আসে তখন সে দেখতে পায় তুলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নারাণ মাস্টার তুলিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

মাস্টার এইয়েচ ? ওরা নেতাইটাকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে গেচে। তুমি একটা বিহিত করো। পবন অনেক কষ্টে কথাগুলো বলে।

কিছু ভেবনা পবন খুড়ো, আমি যখন আছি, তখন নেতাইকে ছাড়িয়ে আনবই।

জানি মাস্টার, আপদ-কালে তুমিই আমাদের একমাত্তর নিববর।

পবনের ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে দর দর করে জল গড়াতে থাকে।

তুলি কাপড়ের আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

নারাণ মাস্টারের সঙ্গে রতন, ভজন, উপেন, গোষ্ঠ, সেলিম, সামাদ এরা সবাই পবনকে ঘিরে তাকিয়ে থাকে। পুব-দিগন্তে ভোরের সূর্য রক্তে রাঙা লাল। আরো লাল হয়ে উঠে।

শীতের শেষ। পড়ন্ত বিকেল। আকাশে ছন্নছাড়া মেঘ। সেই মেঘের ছায়ায় বিদায়ী সূর্যটা ঢেকে গেছে। সুতরাং মনে হয় সন্ধ্যে। নেড়া শিমূল গাছটার মাথায় বসে থাকা শঙ্খচিলটা এতক্ষণে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বিস্তীর্ণ মাঠ। দিগন্তসীমায় তিতাস নদী বয়ে চলেছে। দু'পারে গাছগাছালীর বন। ঝাপসা। আরো ঝাপসা—নারকেল সুপারি গাছের ঝিরঝিরে পাতা।

আমিরআলি ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসে। সবুজ কলাই শাকে ঢাকা মাঠ। সেই মেঠো পথ ধরে। বারে বারে তার পা দুটো জড়িয়ে যায় সেই কলাই লতায়।

ব্যস্ত আমিরআলি দ্রুত-পায় হেঁটে চলে। আকাশের নৈঋত কোণে ঘন মেঘ। ঝড় উঠবে এখুনি। আমিরআলি তাই জোরে পা চালায়।

প্রায় মাইল তিনেক পথ হেঁটে এসেছে আমিরআলি। সেই আশুগঞ্জ থেকে। সেখানে মিটিং-এ গিয়েছিল সে। পার্টি অফিসের মিটিং ছিল আজ। গ্রামবাসীরা অনেকেই জমায়েত হয়েছিল সেই মিটিং-এ।

অদূরে মাঠের শেষপ্রান্তে, ঝোপঝাপের মাঝে উঁকি মারে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। মনে হয়—ছোট্ট একটি গ্রাম। হ্যাঁ, গ্রামই বটে। 'ঝাউদিয়া' গ্রাম। সেই ছোট্ট গাঁয়েরই চাষী-গেরস্থদের মধ্যে আমির আলিও একজন।

আমিরআলিও হাঁটতে থাকে। পথ যেন আর শেষ হয় না।

অদূরে সবুজ রেখা অস্পষ্ট দেখায়। এতক্ষণে সারা আকাশময় মেঘ ছড়ায়। ঘন কালো মেঘ। আর সেই সঙ্গে দমকা বাতাস। দূরে সেই তিতাসের পারে নারকেল সুপারি গাছগুলো যেন ভেঙে পড়ে। বাঁশ-ঝাড়ে শোঁ শোঁ, শাঁই শাঁই শব্দ হয়। বেলা বোধ হয় শেষ। আমিরআলি ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে হবে। তারপর আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমিরআলির। সেইরকম কথাই হয়েছে সেই পার্টি অফিসে। আমিরআলি আবার তাকায় আকাশের দিকে। বড় অস্থির হয়ে ওঠে সে। আকাশে যতটা ঝড়, অন্তরে তার চাইতে দ্বিগুণ বেগে ঝড় বইছে আমিরআলির। দুর্দমনীয়। দুরন্ত ঝড়।

তিরিশ বছরের জোয়ান মরদ আমিরআলির বলিষ্ঠ দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জোয়ার বয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মিটিং-এ শোনা বক্তৃতার টুকরো অংশ ভেসে ওঠে আমিরআলির মনে।—বন্ধুগণ আর সময় নষ্ট নয়। 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' দখলের জন্যে পাক হানাদাররা এগিয়ে এসেছে। 'উজানেশ্বর' সেতুর মুখে আমাদের মুক্তি ফৌজেরা তাদের সঙ্গে লড়াই করছে। পাক সৈন্যেরা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময়ে আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের ওপর। আমাদের সোনার বাংলাদেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলি ওই বিদেশী পাক হানাদারদের।

বক্তৃতার বাণীগুলো আমিরআলির মনে দারুণ আলোড়ন তুলছে। তাই সে চঞ্চল এবং অস্থির হয়ে আজকেই পার্টি অফিসে মুক্তি ফৌজের সভ্য খাতায় নাম লিখিয়েছে।

বিবি নসুনবানুকে আমিরআলি কিছুতেই জানাবে না। জানাতে পারবে না।

এখনো বছর ঘোরেনি বিয়ে করেছে আমিরআলি। ছন্নছাড়া সংসারটা প্রায় গুছিয়ে তুলেছে নসুনবানু। তবে মানুষটাকে নিয়ে যত

ভাবনা। তাই আমিরআলিকে চোখে চোখে রাখে সে। কী জানি কখন চোখের আড়াল হবে মানুষটা। আমিরআলিকে নিয়ে যত রাজ্যের ভয় নসুনবানুর।

হঠাৎ এই মুহূর্তে নসুনবানুর কথা ভেবে আমিরআলি খুশি কী বিরক্ত ঠিক বোঝা যায় না। সে আপন মনে বিড় বিড় করে ওঠে—আচ্ছা মাইয়ালোকের পাল্লায় পড়ছিরে বাপু অর লইগ্যা কিচ্ছু করণের উপায় নাই। কথাগুলো আমিরআলির মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়।

গায়ের মোড়লরা আমিরআলিকে খাতির করে। আমিরের নরম ব্যবহারে গ্রামবাসীরা সবাই ওকে ভালবাসে। যে যখন বিপদে পড়ে ডেকেছে, আমিরআলি তখনই তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাইতো নসুনবানুর ভয়। ভাবে—কহন যে মানুষটারে কোন কাজে ভিড়াইয়া দিবো অরা। কওন যায় না।

দেশে লড়াই লেগেছে। দলে দলে জোয়ান ছেলেরা সবাই লড়াইয়ে যাচ্ছে। আমিরআলিকেও ডাকাডাকি করে সবাই। মোড়ল এসে রোজই আমিরআলিকে মিটিং-এ ডেকে নিয়ে যায়। আড়ালে আবডালে কী সব কানাকানি এবং কথাকথি হয়।

নসুনবানুকে কিছুতেই জানতে দেয় না আমিরআলি। তবে নসুনবানু একটু-আধটু বুঝতে পারে যে, ওর মানুষটাকে নিয়ে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে।

আমিরআলির মুখে বোধহয় একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বউকে ভাবিয়ে তুলতে ওর মন্দ লাগে না। তাই বুঝি ওকে ভাল লাগে আমিরআলির। তবে তার জন্যে ভাবতে ভাবতে নসুনবানুর যে মন খারাপ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখে আমিরআলি। তাইতো নসুনবানুর কাছে এসব খবর লুকোতে চেষ্টা করে সে।

সন্ধ্যে যখন ঘোর—তখন আমিরআলি বাড়ি ফেরে। নসুনবানু ঘরের আগল খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ

ফুটে ওঠে। জলের বদ্‌না আর গামছা আমিরআলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—কৈখন অ্যাইলা গো! এই ঝড় তুফানে ছিলা কোয়ানে?

—গেছিলাম হেই আশুগঞ্জে। এট্টস্‌ কাম আছিল।

মুখ ধুতে ধুতে আমিরআলি উত্তর দেয়। তারপর গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছতে থাকে। মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে সে। এতক্ষণে ক্লান্ত দেহটা একটু বিশ্রাম পায়।

সেই ভোর সকালে উঠেই হালগরু নিয়ে মাঠে গিয়েছিল আমিরআলি। দুপুর গড়িয়ে যেতে তবে ঘরে ফিরেছে। তারপর একমুঠো কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজে আবার বেরিয়ে পড়েছে আশুগঞ্জের দিকে।

নস্নুনবানুর মুখ ভার।

আজ কদিন থেকে আমিরআলি ব্যস্ত। ক্ষেত-খামারে যাওয়া, এমন কি নাওয়া-খাওয়া কোনটাই ঠিকমত করতে সময় পায়নি সে। এসব কারণেই নস্নুনবানুর মুখ ভার। আমিরআলি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ঠিক আন্দাজ করে। অন্যদিন হলে আমিরআলি নস্নুনবানুর এই থমথমে ভাবটা কাটাতে সচেষ্ট হত। কী করে নস্নুনবানুর মুখে হাসি ফোটানো যায়। তার চেষ্টা থাকত কিন্তু আজ আমিরআলির মনের অবস্থা সে রকম নয়। তাই পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সে কী যেন ভাবে আর বিড়ি ফুঁকতে থাকে।

নস্নুনবানু হ্যারিকেনের আলোর সামনে বসে কাঁথার পাড়ে সুতোর নক্সা তোলে। আর আমিরআলিকে লক্ষ্য করে। সময় সময় নস্নুনবানুর চোখে আমির আলির চোখ পড়লে নস্নুনবানু একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে চঞ্চলতা আমিরআলিকে স্পর্শ করে কিনা বোঝা যায় না।

ওরা দুজনেই নীরব। কারোর মুখে কথা নেই। নস্নুনবানু কাঁথায় সুচ ফুঁড়ছে। আমিরআলি তখনো বিড়ি ফুঁকছে।

বাইরে আবছা অন্ধকার। আকাশে ছন্নছাড়া মেঘ। এতক্ষণে দমকা হাওয়ার তোড়ে মেঘের ঘনত্ব কেটে গেছে। ঝিরঝিরে দু'চার

ফোঁটা বৃষ্টি হলেও আকাশে একফালি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা যায়।

নস্নুনবানু এগিয়ে আসে। আকাশের দিকে একনজর তাকিয়ে বলে ওঠে—মেঘ পাতলা হইছে। চাঁন্দ দেখা যায়। আর বৃষ্টি হইব না। নস্নুনবানু খুশিতে ভরে ওঠে। আমিরআলির কাছে এগিয়ে আসে। আমিরআলি নস্নুনবানুর উচ্ছ্বলতা লক্ষ্য করে। যৌবনে ভরন্ত নস্নুনবানুর মুখখানায় যেন মায়া আছে। আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণে মুগ্ধ না হয়ে পারে না আমিরআলি। সে নস্নুনবানুকে দেখতে থাকে। এই ক'মাসে যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে নস্নুনবানু। ভারি সুন্দর দেখায় তাকে। এ সময়টায় মেয়েদের গতরে জোয়ার আসে। সেই জোয়ার বেগবতী হয়ে ওঠে। নস্নুনবানু এখন একটি বেগবতী নদী। সেই নদীতে আমিরআলিরও বোধহয় তলিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। তাই সে আবার তাকায় নস্নুনবানুর দিকে। নস্নুনবানু আমিরআলির দিকে তাকিয়ে আবার বলে—আইজকা আর বৃষ্টি হইব না, মন করি।

আমিরআলি এইবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে। তারপব বলে—হেইরকমই মনে হইত্যাছে। এবারে আর একটা বিড়ি ধরায় সে। তারপর টানতে থাকে।

—আরে শুনছনি? সহসা বলে ওঠে নস্নুনবানু।

—কী শুনুম? আমিরআলি উত্তর দেয়। হেই শোন। কারা যেন কি সব কইতে কইতে এই দিকে আইত্যাছে।

আমিরআলি কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে।

মিছিল ক্রমেই এগিয়ে আসে। সেইসঙ্গে একাধিক কণ্ঠধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাঁক দিয়ে ডাকছে কারা
মুক্তিফৌজের সভ্য যারা,
এস জোয়ান শপথ নাও
মুক্তি যুদ্ধে এগিয়ে যাও।

আমিরআলি দারুণ উৎসাহে অধীর হয়ে ওঠে।—অরা আইস্যা পড়ছে! গ্রামশুদ্ধা মানুষ মিছিলে লাইম্যা পড়ছে।

নসুনবানু আমিরআলির কাছে আরো এগিয়ে আসে। তারপর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমিরআলির মুখের দিকে। আমিরআলি লক্ষ্য করে—নসুনবানুর দু'চোখে জল নেমেছে। ব্যথিয়ে ওঠে মনটা। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। নসুনবানু এতক্ষণে আমিরআলির বুকে আছড়ে পড়ে। কাঁদতে থাকে।—না গো না। তুমি অগোলগে যাইতাম পারবা না। তোমারে আমি যাইতাম দিমুনা!

মিছিল আরো এগিয়ে আসে। ওদের সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শোনা যায়। মিছিল আমিরআলির বাড়ি ছাড়িয়ে পূব দিকে এগিয়ে যায়।

নসুনবানু আমিরআলিকে আঁকড়ে ধরে। আমিরআলি সান্ত্বনা দেয়। বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু নসুনবানু বুঝতে চায় না।

আমিরআলির মায়া হয়। সাধারণ চাষী-ঘরের মেয়ে নসুনবানু। ছোটবেলায় বাপ-মা হারিয়েছে সে। তারপর থেকেই চাচার ঘরেই মানুষ। এখনো একটা বছর কাটেনি বিয়ে হয়েছে ওর। সখ-আহ্লাদ, মনের মতো করে সংসার সাজাবার সাধ কিছুই মেটেনি। মা হবার দারুণ আকাঙ্ক্ষা সর্বদা জেগে রয়েছে ওর মনে।

নসুনবানুর অন্তর্বেদনা এতটা বুঝতে না পারলেও অনেকটা উপলব্ধি করে আমিরআলি। ওর দরদী মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় নেই। মুক্তিফৌজে সে নাম লিখিয়েছে। মাতৃভূমি। জন্মভূমির লাঞ্ছনা সে কিছুতেই সইতে পারবে না।

আশুগঞ্জের মিটিং-এ যে বক্তৃতা শুনেছে তা কখনো আমিরআলি ভুলতে পারবে না। আবার মনে পড়ে—বন্ধুগণ ইসলামাবাদের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে যে নির্মম নরহত্যা এতদিন বাংলা-দেশের বুকের ওপর চলেছে। আজ মোকাবিলা করবার দিন এসেছে। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান, আমরা সবাই ভাই-ভাই, জয় বাংলা।

'ও আমার সোনার বাংলা মা
আমি তোমায় ভালবাসি।,

আমিরআলির হৃদয়তন্ত্রীতে এই গানের কলিটি বারে বারে বেজে ওঠে। শুধু আমিরের নয়, বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে। প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে এই গানের কলিটি উচ্চারিত হয়।

আবার সেই কণ্ঠস্বর—আমিরআলির কানে বেজে ওঠে—বন্ধুগণ! আর বিলম্ব নয়। দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়াই করতে হবে। রক্তক্ষয়ী লড়াই। চক্রান্তকারী রক্ত শোষকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক। সকলের সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে। আমরা বাঙালী। আমাদের দেশের জন্য আমরণ লড়াই করতে হবে।

কথাগুলো আমিরআলির মনে তোলপাড় করতে থাকে। সে যেন অস্থির হয়ে পড়ে। তবু অনেক সংযমের সঙ্গে নসুনবানুর সামনে নিজেকে সামলে রাখে।

আমিরকে অন্যমনস্ক দেখে নসুনবানু বলে ওঠে—কী হইছে তোমার? অমন চুপ কইর‍্যা বইস্যা রইছ ক্যানে? আর রাইত করনের কাম নাই। খাওন-দাওন সাইর‍্যা শুইয়া পড় গিয়া।

নসুনবানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আমিরআলি। কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করে সে নসুনবানুর চোখে মুখে। তারপর বলে—হু। চল যাই। আমির উঠে পড়ে।

বাড়িতে ওরা দুজনে ছাড়াও আমিরের বুড়ো বাপ আছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। পড়তি দেহটাও তেমন সুবিধের নয়। তাই বুড়োকে নসুনবানু সন্ধ্যের আগেই খাইয়ে দেয়।

আজো বুড়ো খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যের পরেই সামনের দাওয়ায় হোগলার মাদুরে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে ওরাও রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। নসুনবানু খুশি। মানুষটারে কাছে পাওয়া গেছে। সারাদিন একটা আতঙ্কের মধ্যে

দিন কাটে নসুনবানুর। কখন কী করে বসে মানুষটা। রাতে আমির ঘরে ফেরে। তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে নসুনবানু।

রাত ঘন হয়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে একটানা। আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ অদৃশ্য। ঘরের পাশে ছাতিম গাছের ডালে বুড়ো প্যাঁচাটা বারে বারে ডেকে ওঠে। রাতের গভীরতা আরো যেন বেড়ে যায়।

আমিরআলির চোখে ঘুম আসে না। দারুন অস্বস্তিতে ছটফট করে সে। আশুগঞ্জের মুক্তিফৌজের অফিসে আজ রাতেই তার যাবার কথা। মুক্তি সেনার একটা দল আজ রাতে রওনা হবে।

তিতাসের তীরে সেই উজানেশ্বর সেতুর ওপর পাকিস্তানী হানাদাররা আক্রমণ চালাচ্ছে। শত শত গ্রামবাসীর বাড়িঘর বিধ্বস্ত। জীবন বিপন্ন। হাজার হাজার মুক্তিফৌজ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে।

হঠাৎ আমিরআলির মনে মিটিং-এ শোনা সেই কথাগুলো আবার ভেসে ওঠে।—অত্যাচারী পাক হানাদারদের বর্বর হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ডকে এভাবে আর সহ্য করা যায় না, তাদের প্রতিরোধ করে বিতাড়িত করতে হবে। বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষদের বাঁচাতে হবে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমিরআলি। তার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। নেতাদের কথাগুলো তার মনের কথা। নেতাদের মত সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে না আমিরআলি। কিন্তু ভাবতে পারে। বুঝতে পারে। তাইতো আমিরআলি অস্থির। নিষ্ঠুর আক্রমণ আর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে ঝাপিয়ে পড়বেই। যে হাতে সে এতদিন কাস্তে ধরতে অভ্যস্ত, সে হাতে আজ কামান দাগাতে ভয় পায় না আমিরআলি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা, মুক্তি ফৌজের কিছুই নেই। তাদের অস্ত্র হল—বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশপ্রেম। মনোবল। অসীম উৎসাহ আর সাহস। দেশপ্রেমের

অদম্য উৎসাহে মুক্তিফৌজেরা এগিয়ে যায়। আক্রমণ গতিরোধ করে। শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়েই ওদের ওপর আবার আক্রমণ চালায়।

আর ধৈর্য রাখতে পারে না আমিরআলি। দুর্দমনীয় আবেগে বেগবান হয়ে ওঠে সে। তাকে যেতেই হবে। এই রাতেই।

নসুনবানু ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত ঘুম। আমিরআলির বুকের ওপর একখানা হাত রেখে পরম তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে নসুনবানু। সহজ, সরল, নিরীহ মেয়ে। স্বামীকে ছাড়া কিছুই জানে না। মায়া হয় আমিরআলির। নসুনবানু আমিরআলিকে খুব ভালবাসে। আমির জানে যে, নসুনবানু তাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারবে না।

খুব সাবধানে নসুনবানুর কোমল হাতখানা বুকের উপর থেকে সরিয়ে রাখে আমিরআলি। খুব সাবধানে নিজেকেও সরিয়ে নেয় সে। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

নিঃশব্দে ঘরের আগল খুলে উঠোনে এসে দাঁড়ায় আমিরআলি। ছাতিম গাছটার পাশে, অন্ধকারে সব ঝাপসা দেখা যায়। প্যাঁচাটা বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। আমিরের মনটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম এক অনুভূতিতে সে করুণ হয়ে পড়ে। ছাতিম গাছের তলায় কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকে, সে নিজেও জানে না। নিঃসহায় নসুনবানু আসন্ন প্রসবা। মা হবার বড় সাধ। আর ক'মাস বাদেই সে সন্তানের জননী হবে। স্বামী, সন্তান আর সংসার নিয়ে সব মেয়েরাই চায় সুখী হতে। কিন্তু নসুনবানুর কপালে কী সে সুখ আছে?

প্যাঁচাটা আবার চেঁচিয়ে উঠতেই আমিরআলির অবশ আচ্ছন্নতা কেটে যায়। সে আবার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। দুর্বলতার অক্টোপাশ-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তারপর একমাত্র হাতিয়ার বল্লমটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে বাড়ি থেকে।

সোজা হাঁটতে থাকে মেঠো পথ ধরে। জোনাকীময় আঁধার রাতে অসীম উৎসাহে হেঁটে চলে আমিরআলি। আশুগঞ্জের পার্টি অফিসে

এখুনি গিয়ে পৌঁছবে সে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর হাঁপিয়ে পড়ে আমিরআলি। রাত গভীর। আকাশের কালো পর্দার গায়ে ছিট ছিট তারাগুলো আঠার মত লেগে রয়েছে। মাঠের প্রান্তে অস্পষ্ট গাছ-গাছালী আর ঝোপ-ঝাড়ে বাতাসের শব্দ। আমিরআলি হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়। একটা শেয়াল ছুটে পালায় ঝোপের দিকে। বোধ হয় কিছু আহার্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছে।

অনেকটা পথ এসে পড়ে আমিরআলি। প্রায় আধাআধি পথ ছাড়িয়েছে। সামনে একটা তাল গাছ বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাল গাছ। গাছটার মাথায় শকুনের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। বোধহয় পাশে কোন মৃতদেহ পড়ে আছে। বাতাসের সঙ্গে পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে আমিরআলির। লড়াইয়ে যে ভাবে লোক মরছে। অসম্ভব কিছু নয়। পথে-ঘাটে, খানা-ডোবায় কত মানুষের মৃতদেহ পচে গলে পড়ে রয়েছে।

আর বেশীদূর এগোতে হবে না। আশুগঞ্জের সীমায় এসে পড়েছে আমিরআলি। মনের গতির সঙ্গে পায়ের গতি ধীর। তাই পার্টি অফিসে পৌঁছতে এখনো কিছুটা পথ হাঁটতে হবে।

পরিশ্রান্ত ক্লান্ত আমিরআলি পার্টি অফিসের সামনে এসে পড়েছে। সেই বিরাট আমগাছটা দেখা যায়। ওই আমগাছটার গোড়াতেই সেদিন সভা হয়েছিল। মিছিল করে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হয়েছিল। নেতারা বক্তৃতা করেছিল। পাশেই পার্টি অফিস। আমিরআলি আর একটু এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। আতঙ্কে আতকে ওঠে। বুকের মধ্যে ধরাস ধরাস শব্দ হয়। চোখের সামনে বিভীষিকা দেখে। মুহূর্তে সেই পার্টি অফিস দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুনে আগুন ছড়ায়। নিঃসহায় মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, ছোটাছুটি। সঙ্গে সঙ্গে মেসিনগানের গুলি ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকে। আর সেই বুলেটের আঘাতে লোকগুলো ইতস্ততঃ

ছিটকে ছিটকে পড়ে।

আমিরআলি বিস্ময়ে হতবাক। এখুনি কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। অগত্যা উপায়হীন হয়ে পাশের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

এতক্ষণে সহজেই বুঝতে পারে—পাক ফৌজেরা আশুগঞ্জ ঘিরে ফেলেছে। তাই অতর্কিত আক্রমণ। পার্টি অফিসের মুক্তিযৌজেরা মোটেই সাবধান হবার সুযোগ পায়নি।

আমিরআলি এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ক্রোধে তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। ইচ্ছে হয়—এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই পাক্ সৈন্যদের ওপর। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র নেই আমিরআলির হাতে। তাই সে বোকার মত মরতে চায় না। মরতে যদি হয় তবে দু'চারটে শত্রুকে মেরে তবে মরবে। সে হাতের মুষ্টিতে ধরা বল্লমটা আবার শক্ত করে ধরে। তারপর সেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে অতি সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকে আমিরআলি। আপাততঃ এখান থেকে পালাতে হবে।

আজকে রাতে মুক্তিফৌজের যে দলটি সেই উজানেশ্বর সেতুর লড়াইএ যাত্রা করার কথা ছিল। তাদের বোধহয় যাওয়া হয়নি। সেই দলটির সব ক'জনই এই পার্টি অফিসে জমায়েত হয়েছিল। খবরটা যেভাবেই হোক শত্রুরা জানতে পেরেছিল। তাই এই হঠাৎ আক্রমণ। সুতরাং বর্বর আক্রমণের জবাব দিতেই হবে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ঝোপের মধ্যে পথ করে এগোতে থাকে আমিরআলি। এ পথ ছাড়া পালাবার অন্য কোন পথ নেই। সব দিকেই শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে।

রাতারাতি তিতাসের তীরে পৌঁছতে হবে। রাত কেটে গেলে আর সেখানে পৌঁছান সম্ভব হবেনা।

আমিরআলি ভাবতে থাকে—যদি ভৈরববাজার কুঠিতে গিয়া খবরডা পৌঁছান যায়, তা হইলেই রক্ষা। আশুগঞ্জের শত্রুগো লগে মুকাবিলা

করন যাইবো।

এতসব হাজার কথা ভাবতে ভাবতে আমিরআলি ঝোপ আর জঙ্গলের পথ ধরে নদীর পারে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা উন্মুক্ত বলে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, চারদিক ভাল করে লক্ষ্য করে সে। কিন্তু কিছু টের পায় না। জায়গাটা নিরাপদ বলে মনে হয় আমিরআলির। কিন্তু তবু সে স্বস্তি পায় না। নিশ্চিন্ত হতে পারে না কিছুতেই।

তিতাসের পার ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আমিরআলি। শান্ত নদী বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর দিয়ে। রাত প্রায় শেষ দণ্ডে এসে পৌঁছেচে। আমিরআলির হাঁটার গতি বাড়তে থাকে।

কিছুটা এগোতেই থমকে দাঁড়াল আমিরআলি। দশ-বার গজ তফাত থেকে কে যেন বলে ওঠে—হলট। বিকৃত গলার কর্কশ স্বরটা শোনা মাত্র আমিরআলি চমকে ওঠে। লক্ষ্য করে—এক এক করে জন কয়েক ছায়ামূর্তি। হাতে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। আমিরআলি বুঝতে পারে—এবারে সে ধরা পড়েছে। আর রেহাই নেই। কিন্তু সহসা দমবার পাত্র সে নয়। একটা কিছু করতেই হবে। এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে মরতে পারবে না সে। 'হয় মারো—নয় মর'। এই কথাটি আমিরআলির মনে ঝড় বইয়ে দেয়। মুক্তি ফৌজের নামে শপথ নিয়েছে সে। কাপুরুষের মত পালাতে পারবে না। আমিরআলি মরবে। সামনাসামনি লড়াই করে মরবে। অন্ততঃ দু'একটা শত্রুকে খতম করতেই হবে।

তেজদীপ্ত মানসিকতায় সাংঘাতিক সচেতন হয়ে ওঠে আমিরআলি। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চায়। কিন্তু এতগুলো রাইফেলধারী শত্রুর সামনে সে একা কী করবে? হাতের বল্লমটা এখনো শক্ত হাতে ধরে রয়েছে আমিরআলি। এই হাতিয়ারটাই তার একমাত্র সম্বল। সে আরো এগোতে থাকে। বল্লমটা হাতের বজ্র মুষ্টিতে শক্ত করে ধরা। জঙ্গলের আড়ালে নিজেকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে এগোতে থাকে আমিরআলি। অনেকটা এগিয়ে যায়। রাতের

অন্ধকারে কিছুই ঠিক করতে পারে না সে। এক দিগভ্রান্ত দিশেহারার মত চলতে থাকে আমিরআলি। কুঠিতে পৌঁছুতেই হবে। যেভাবেই হোক। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটি গুলি এসে আমিরআলির পায়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে ঝোপের আড়ালে পড়ে যায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে আমিরআলি। উত্তেজনায় ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গজড়াতে থাকে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারল না। বাঁ পায়ের গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা। আমিরআলি আমল দেয়না। তবু সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে থাকে। প্রাণে তার ভীষ্মের প্রতীজ্ঞা। 'মারো—নয় মর'। সহসা তরিৎগতিতে হাতের বল্লমটা ছুঁড়ে মারল আমিরআলি। মোক্ষম হাতের নিশানা। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমিরআলির বুক আনন্দে নেচে উঠল। যা হোক একটা শত্রু শেষ হল। সেই মুহূর্তে আবার গর্জে উঠল স্টেনগান। ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটতে লাগল। আমিরআলি ঝোপের আড়ালে লুটিয়ে পড়ল। নদীর ঢাল থেকে গড়াতে গড়াতে অনেকটা নীচে এসে কাশবনের মধ্যে পড়ে গেল। চারদিক থেকে গুলি ছুটতে লাগল। রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। সার্চ লাইটের আলো ফেলে শত্রুরা আমিরআলিকে খুঁজতে লাগল।

সার্চ লাইটের তীব্র আলো হঠাৎ এসে আবিষ্কার করল আমিরআলিকে সেই কাশবনের মধ্য থেকে। আবার গর্জে ওঠে বন্দুক। আমিরআলির সর্বাঙ্গ গুলিবিদ্ধ হয়ে যায়। এবারে সে কাতর আর্তনাদে নেতিয়ে পড়ে। আমিরআলি বোধহয় সংজ্ঞা হারায়।

শত্রুরা ভারী বুটের লাথিতে ক্ষত-বিক্ষত আমিরআলিকে নাড়াচাড়া করে দেখে। তারপর আরো দু'চারটে লাথি মারে। এবারে আমিরআলির অচৈতন্য দেহটা জল ছুঁই-ছুঁই তিতাসের তীরে পড়ে থাকে।

রাত্রি যখন শেষ। দেখা যায় আমিরআলির মৃতদেহটা পড়ে

আছে। শরীরের সবটুকু রক্ত ঝরে ঝরে তিতাস নদীর জল লাল করে তোলে। আর সেই রক্ত-ছায়ায় পূব-দিগন্ত রক্তিম হয়ে ওঠে।

…বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে গল্পটি রচিত। যখন বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছিল। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফলের ওপর লক্ষ্য রেখেই গল্পটি রচিত হয়েছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃ ভ্রমণ করা মাধব মাস্টার মশাইর চিরদিনের অভ্যেস। তালবাঁধা গ্রামের মেঠো পথে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে হাঁটতে যখন মাধব মাস্টার নীলগঞ্জের হাই রোড অবধি আসেন, তখন তাঁর চোখে পড়ে—পূবদিগন্তে ভোরের সূর্য সবুজের শিরে শিরে আবির ছড়ায়। হালকা ফুরফুরে হাওয়ায় হিজলের পাতা নড়ে। কচি কলাপাতার ডগায় কাঁপন জাগে। নাম না জানা পাখিরা সব মিষ্টি মিষ্টি গান গায়। এই শুচি-স্নিগ্ধ পরিবেশের সুখ-স্পর্শে মাধব মাস্টার মুগ্ধ হন। দারুণ বিস্ময়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তে ভুলে যান সংসারের সব সম্পর্ক, সব আকর্ষণ।

বিপত্নীক মাধব মাস্টারের সংসারে তেমন টান নেই বললেই চলে। এখন ছেলেদের হাতে সংসার। তিনি সেখানে বাড়তি লোক।

সারাজীবন এই তালবাঁধা গ্রামের ইস্কুলে শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন মাধব মাস্টার। কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছেন সংসার, কিন্তু ছেলেদের তেমন মানুষ করে তুলতে পারেননি। ফলে কোন ভাল চাকরি জোটেনি তাদের।

গ্রামের বাজারে মুদি দোকান চালায় ছেলেরা। তবু ভাল। বখাটে, বাউণ্ডুলে অথবা মস্তানি করে ঘুরে বেড়ানর চেয়ে অনেক ভাল। দুটি মেয়ে কোন রকমে পাত্রস্থ করা হয়ে গেছে। সুতরাং যা কিছু জমিয়েছিলেন—মেয়েদের বিয়ে দিতেই শেষ। অগত্যা নিরুপায় হয়ে এই বৃদ্ধ বয়েসে ছেলেদের ওপরই নির্ভরশীল হতে হয়েছে মাধব মাস্টারমশাইকে।

যতদিন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, সে ক'টা দিন তবু কেটেছে একরকম।

বছরখানেক হল স্ত্রী গত হয়েছেন। সেই থেকে মাধব মাস্টার নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে করেন। সংসারে ছেলেরা, ছেলের বউরা রয়েছে। তাদের নিয়ে সব ভুলে থাকতে পারেন তিনি। কিন্তু অভাবের সংসারে দিন রাত ঝগড়া-ঝাটি লেগেই আছে। কেউ মাধব মাস্টারের দিকে লক্ষ্য রাখে না।

লাঠি ঠুকে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছেন মাধব মাস্টার। অবশ্য এই অবধি তিনি প্রাই রোজই আসেন। এখানে এলেই মংরুর সঙ্গে দেখা হয়। মাঠে মাটি কাটছে মংরু। কোদাল দিয়ে চাক চাক মাটি কেটে ঝুড়ি ভর্তি করছে সে। মাটি কেটে পেট বাঁচায় মংরু। মাধব মাস্টারের আলাপ আছে। মংরুকে ভাল করে চেনেন তিনি। বেচারা মংরু ভাল মানুষ।

গাঁয়ের চাষী, মজুর, এবং খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের বরাবর ভালবাসেন মাধব মাস্টার। ওদের সুখ দুঃখের খবর রাখেন। সকলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করেন তিনি।

সাঁওতাল পরগণার মানুষ মংরু। এই বাংলাদেশেই সারা জীবন কাটিয়ে দিল। মাটি কাটা মানুষ সে।

নীলগঞ্জের এই বড় সড়কটা তৈরীর সময় ডাক পড়েছিল মংরুর।

প্রায় বিশ বছর আগে এই বাংলাদেশে এসেছে মংরু। সেই থেকে সে রয়ে গেছে এখানে। এদেশ খুব ভাল। এখানকার আকাশ, বাতাস, গাছপালা, পাখ-পাখালি, মানুষজন। সবকিছু দারুণ ভাল লাগে মংরুর। মাধব মাস্টার মশাইকেও খুব ভাল লাগে। যখন মাটি কাটা কাজ থাকেনা, তখন জন মজুরের কাজ করে মংরু। কাজ যখন একদম না থাকে তখন মাধব মাস্টার মশাইর কাছে এলে কাজ পাওয়া যেত। আর কোথাও কিছু না হোক, মাধব মাস্টার তার ইস্কুলের মাঠে, বাগানে অথবা যে কোন রকম কাজে লাগিয়ে দিতেন মংরুকে। তাতে মন্দা বাজার মোটামুটি মিটে যেত। অন্য সব দেশওয়ালি সাগরেতরা মন্দার সময় মুলুক চলে গেলেও মংরু মুলুকমুখো হয়নি

কখনো। সে এখানেই সুসময় দুঃসময় বরাবর সমান মত কাটিয়ে দিয়েছে। মাধব মাস্টার বিশেষ করে এই জন্যেই মংরুকে আরো বেশী ভাল বাসতেন। অবশ্য সে সব অনেক দিনের কথা। তখন মাধব মাস্টারের কর্মময় জীবন। সেই থেকেই মংরুর সঙ্গে একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর সেই সম্পর্ক এখনো এই অবসর জীবনেও অব্যাহত আছে। বলতে গেলে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

দেশে বউ, ছেলে সব আছে মংরুর। ওরাও জন খেটে খায়। নিজেদের জমিজমা নেই। অভাবে দিন কাটাতে হয়। এখান থেকে মংরু টাকা পাঠালে অভাব অনেকটা মিটে যায়।

মাধব মাস্টার আরো খানিকটা এগিয়ে যান। প্রায় মংরুর কাছাকাছি। পরিশ্রমী মেহনতী মানুষ মংরু। যদিও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তবুও মজবুত পেটাই দেহ। কৃষ্ণবর্ণ। ঘাম ঝরা ইস্পাতের ঢালের মত মাংসপেশীগুলো ভোরের সোনা রোদে চক্ চক্ করছে। সত্যি মংরু এখন আলাদা মানুষ। কোদাল কুপিয়ে মাটি কাটতে ব্যস্ত সে। কাক সকালে ওদের কাজ শুরু হয়। দেহ খাটিয়ে পয়সা রোজগার করে ওরা। সুস্থ সবল দেহই ওদের একমাত্র সম্বল।

মংরু মাধব মাস্টারকে দেখতে পেয়েই কোদাল থামিয়ে হাত তুলে সেলাম জানায়। তারপর সমীহ করে বাংলায় বলতে চেষ্টা করে।
: মাস্টরবাবুর তবিয়ত কেমুন আছেক।

: এই কোনরকম। এ বয়েসে আবার থাকা। মাধব মাস্টার বয়েস অপেক্ষা যেন একটু বেশী বুড়িয়ে গেছেন। হাতের লাঠিটা বার কয়েক ঠুকে ঠুকে তিনি শুধালেন : তোর খবর কী।

: আমি তো বাবু ভাল আছেক। কিন্তুক মুলুক থিকে কুনো চিঠি আসচেক নাই। মংরুর মুখখানা বিষন্ন দেখায়। মাধব মাস্টার বুঝতে পারেন বাড়ির লোকের জন্যে মংরুর মনটা খারাপ। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : চিন্তা করিস না। চিঠি নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মাধব মাস্টার। দূরে মাঠে চাষীরা ধান

কাটছে। হলুদ সোনা মাঠ। চাষীদের মনে আনন্দ। নতুন ধান ঘরে উঠবে। ঘরের বউ, কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটবে।

মাধব মাস্টারের বুক খুশিতে ভরে ওঠে। আঃ দু' চোখ জুড়িয়ে যায়। গোছা গোছা ধানের আঁটি শুইয়ে রাখা হয়েছে। চাষীদের হাতে কাস্তে চলছে দ্রুত গতিতে। খস খস ধান কাটার শব্দ উঠছে।

মাধব মাস্টার লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগলেন। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন সেই কালভার্ট পর্যন্ত। এইটুকুন হাঁটা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যেস। আবার ফিরে এলেন তিনি মংরুর সামনে। মংরু তখনো মাটি কাটছে। কোদাল কুপিয়ে মাটি কেটে কেটে ঝুড়ি ভরছে। এই সকালে মংরুকে দেখে কে বলবে যে, এই মংরু সেই সন্ধ্যার আবছা আলো-আঁধারির মাঝে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা মংরু। দুঃখ, কষ্ট ওরও যে আছে তা এখন মংরুকে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। কদিন ধরে রোজ সন্ধ্যোর সময় তাড়ি গিলে মংরু বুদ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। গাঁয়ের ছেলেরা ক্ষেপায়, দূর থেকে বক দেখায়। ঢিল মারে। মংরু ক্ষেপে যায়। গালাগাল করে।

মাধব মাস্টার ভাবেন—কেন এমন হয়? কিসের জ্বালা মানুষটার। সকালবেলার সুস্থ, স্বাভাবিক এবং পরিশ্রমী মানুষটা সন্ধ্যার সময় তাড়ি গিলে পড়ে থাকে কেন? কিছুদিন ধরে রোজ সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে লক্ষ্য করেছেন মাধব মাস্টার।

কিন্তু এ ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটল। একদিন নয়, দু'দিন নয়, পর পর কয়েকদিন মংরুকে আর দেখা যায়নি সন্ধ্যার সময় রাস্তায় পড়ে থাকতে।

দু'চারদিন অসুস্থ ছিলেন মাধব মাস্টার। ভোরে বেরোতে পারেননি। বিকেলেও না। এই নিঃসঙ্গতার মাঝে বারে বারে মংরুর কথা মনে করেছেন মাধব মাস্টার মশাই। মানুষটার হল কী? তবে কী অসুখ-টসুখ করল? অথবা অন্য কোথাও চলে গেল? আত্মীয় নয়। তবুও মংরুর জন্যে মাধব মাস্টারের মন টাটায়। বহুদিনের আলাপ

পরিচয় মংরুর সঙ্গে। সমবয়েসী মানুষ। একটা যেন আন্তরিক টান অনুভব করেন মাধব মাস্টার। বহুদিন ধরে মংরু এ গাঁয়ে বাস করছে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মানুষটার সঙ্গে দেখা হত। সুখ-দুঃখের কথা হত। অসুস্থ হয়ে পড়ে থেকে মাধব মাস্টারের আরো বেশী করে মংরুর কথা মনে পড়তে লাগল। কেমন যেন একটা মায়া দানা বেধে উঠেছিল। নিঃসঙ্গতার মাঝে মংরুই ছিল মাধব মাস্টারের একমাত্র অবলম্বন।

ভাল হয়ে, সুস্থ হয়ে, আবার সকালে সন্ধ্যায় মংরুকে খোঁজ করেন মাধব মাস্টার। কিন্তু মংরুর সঙ্গে দেখা হয় না। সত্যিই তো কী হল মংরুর। গেল কোথায়? মাধব মাস্টার কিছুই ভেবে পান না। রাস্তার ছেলে ছোকরাদের কাছেও জিজ্ঞেস করেছিলেন মাধব মাস্টার। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত একদিন বিকেলে মংরুর আস্তানার দিকে চললেন মাধব মাস্টার। দেখা যাক খোঁজ নিয়ে। কী হল মানুষটার।

কিছুটা পথ যেতেই নীলগঞ্জের হাই রোডের ওপর মংরুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মাধব মাস্টার অবাক। মরুকে চেনা যায় না। আজকের মংরু তাড়ি খেয়ে মাতাল নয়। সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক মানুষ। হাঁটুর নীচে নামিয়ে ধুতি পরা। গায়ে ফতুয়া গোছের একটা জামা এবং কোমরে একটা লাল গামছা জড়ান, দেখতে ভালই লাগছে মংরুকে। দীর্ঘদিনের মধ্যে এরকম সাজে এই প্রথম দেখলেন মাধব মাস্টার।

মংরুকে হাসি-খুশি দেখে মাধব মাস্টারও খুশি হলেন। এবং আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন: কী মংরু তোর খবর কী? এতোদিন কোথায় ছিলি?

ইজ্ঞে ভাল মাস্টরবাবু। সেলাম। পান চিবোতে চিবোতে এক মুখ হেসে মংরু উত্তর দিল।

: এত সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছিস রে।

মাধব মাস্টারের কণ্ঠে উৎসাহের সুর।

: সি গাঁয়ে সংক্রান্তির মেলা বসিন্ছে। তাই একটু বেড়াতে যেচ্ছি সিখান্টে।

: তাই নাকি। তুই মেলায় যাচ্ছিস: বেশ ভাল। মাধব মাস্টারের চোখে পড়ল—মংরুর বয়েস যেন অনেক কমে গেছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: এই এতদিন কোথায় ছিলি? বললি না তো।

: ইজ্ঞে ঘরে ছিলম। মুলুক থিকে বউ আসিছেক তাই সরল মানুষ মংরু লজ্জায় চুপ রইল। কিন্তু মাধব মাস্টার চুপ রইলেন না। তিনি বললেন: ঘর থেকে বেরোতে দেয়নি বুঝি। মাধব মাস্টারের কথা শুনে মংরু দাঁত বার করে হাসল। তারপর বলল: আজ উকে মেলায় লিয়ে যেচ্ছি।

মংরু পিছন ফিরে জোরে হাঁক ছাড়ল: আরে রাধিয়া ইদিকে জলদি আয়।

মাধব মাস্টার দেখলেন মংরুর পেছনে আসছে ওর বউ। বুড়ো বয়েসেও স্বাস্থ্য ভাল। ঘন কালো গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচা পাকা সিঁথির মাঝে সিঁদুরের ছোপ। কানে বড় বড় একজোড়া রূপোর মাকড়ি। নাকে রূপোর ফুলতোলা নাকচাবি। বেশ মানিয়েছে মংরুর সঙ্গে।

চোখের চশমাটা নামিয়ে মাধব মাস্টার ভাল করে দেখলেন। চশমাটাকে রুমাল দিয়ে বারে বারে মুছলেন। তারপর আবার চোখে লাগালেন।

মংরু বউকে বলল: মাস্টরবাবুকে সেলাম দে, বহুত ভাল মানুষ।

ওদের এত সব কাণ্ড দেখে মাধব মাস্টার রীতিমত অবাক হয়ে যান। তারপর হাত তুলে বললেন: ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। তোরা মেলায় যাবি তো তাড়াতাড়ি যা। আর দেরী করিস না, বেলা পড়ে এল যে।

ইজ্জে মাস্টরবাবু। মোরা ইবারে যাই। আবার হাত তুলে সেলাম জানাল মংরু। তারপর বউকে বলল: চলরে রাখিয়া জলদি চল।

ওরা দুজনে মেলার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল।

মাধব মাস্টার ওদের গতিপথে তাকিয়ে রইলেন। সহসা তাঁর স্মৃতির শুকনো পাতাগুলো যেন আচমকা নড়ে উঠল—এমনি এক পৌষের মেলায় মাধব মাস্টারও গিয়েছিলেন। সেদিন সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মনোরমা। কিন্তু আজ?

নিভন্ত বেলার পশ্চিম দিগন্তে চোখ রেখে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাধব মাস্টার। তাঁর মনে হতে লাগল—তিনি এখন নিতান্তই নিঃসঙ্গ।

খিড়কির ফাঁক গলে একফালি রোদ্দুর চালাঘরের মাটির দাওয়ায় ঝিমিয়ে পড়েছে।

তাহেরআলি রোগ যন্ত্রণায় কোকাচ্ছে। পাশে বসে আমিনা সোয়ামীর রোগ যন্ত্রণার বাড়াবাড়ি দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একটা হতাশার ছায়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রায় মাস ছয়েক হয়ে গেল তাহের আলি রোগে পড়েছে। বুকে ব্যথা। কাশি, জ্বর। কঠিন ব্যামো। মানুষটা ধুকছে। বুকের পাঁজর হাপড়ের মত ওঠা নামা করছে। ঘোলাটে চোখ দুটো মরা মাছের আঁশের মত ফিকা লাগছে। মানুষটার দিকে তাকান যায় না। আমিনার বুক চিরে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বেশ শক্ত-সামর্থ দেহ ছিল মানুষটার।

সেবারে গাঁয়ের চৌধুরী বাবুদের পুকুর কাটানোর সময় কী খাটুনিটাই না খেটেছিল। কোদাল কুপিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি কেটেছে মানুষটা। কাজ দেখে চৌধুরীবাবুরা দারুন খুশি হয়েছিলেন।

কিন্তু আজ ছ'মাস ধরে রোগে ভুগে ভুগে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষটা। তবু কেউ একবারও খবর নেয় না। মানুষটা বেঁচে আছে কী মরে গেছে। আমিনার দারুন দুঃখ। আজ তাদের এই চরম বিপদে এমন কেউ নেই যে, একবার মুখ তুলে তাকায়। আমিনার বাপের বাড়ির অবস্থাও ভাল নয়। ছোটবেলায় বাপ-মা হারিয়েছে আমিনা। খুড়োর ঘরে মানুষ হয়েছে সে। একটু সেয়ানা হতেই খুড়ো আমিনাকে তাহেরআলির হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই কিশোরী বয়েসেই আমিনা তাহেরআলির সংসারে এসে সব দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল।

সোয়ামীর সোহাগে পাঁচ/সাত বছর বেশ সুখেই কেটেছে আমিনার। কিন্তু কোলে বাচ্চা আসেনি এই যা আফশোস। শেষ অবধি সব সুখে ছাই ছড়িয়ে কোত্থেকে এল এই কঠিন ব্যামো। এই ব্যামোতে মানুষটা মারা যাবে গো। আমিনার তু'চোখ ভেঙে হু-হু করে জল আসে। সে আর সইতে পারেনা। রোগ-যন্ত্রণা-কাতর তাহেরআলির আর্তনাদ আমিনা আর শুনতে পারে না। আমিনা আবার আঁচলে চোখ মোছে।

গাঁয়ের ডাক্তার গজেন বত্তি। গোড়া থেকেই তাহেরআলির চিকিৎসা করছে। কিন্তু আসান হচ্ছে না। আমিনার রুচি লাগে না এই গজেন বত্তিকে। রোগীদের কাছ থেকে কসাইয়ের মত পয়সা আদায় করে সে। এককালে গজেন বত্তি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার ছিল। গেরামের সাধারণ মানুষের জ্বর, জ্বালা, পেটের ব্যামো ইত্যাদি টুকটাক চিকিৎসা করে বেশ তু'চার পয়সা করেছে লোকটা।

কলকাতা থেকে বেশ দূর এই গাঙনাপুর গেরামে পাশ করা ভাল ডাক্তার না থাকায় গজেন বত্তির খুব সুবিধে হয়েছে। চাষী প্রধান গেরাম এই গাঙনাপুর। এখানে চাষী, কামার, কুমার, সহজ সরল খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে খুব সহজে ঠকাতে পারে গজেন বত্তি। এদের অসুখ-বিসুখ করলে উপায়হীন গেরামের লোকেরা অবশ্যই আসতে বাধ্য হয় এই হাতুরে গজেন বত্তির কাছে।

আমিনাকেও আসতে হয়েছে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল মানুষটার ব্যামো ভাল হল না। মোটেই আসান হল না। জ্বর, কাশি হাঁপানি কিছুই কমল না।

পয়সা-কড়ি যা ছিল এতদিনে সব শেষ হয়ে গেছে। অযথা হয়রানি করে মানুষটাকে আজ জবাব দিয়েছে গজেন বত্তি। বলেছে: রোগীকে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যামো এখানে সারবে না।

আমিনার মাথায় যেন বাজ পড়ল। শক্ত ব্যামো, এখানে সারবার

নয়। কলকাতা! হাসপাতাল! আমিনা এখন কী করবে? সে কিছুই ঠাওর করতে পারে না। দারুন ঘাবড়ে গেল আমিনা। সামান্য একটি গ্রাম্য চাষী বউ সে। কোনদিন কলকাতার মুখ চোখে দেখেনি। সে কেমন করে নিয়ে যাবে এই মরণাপন্ন রোগীকে কলকাতার হাসপাতালে। আমিনা গজেন বদ্যির ডাক্তারখানা থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসে।

ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে তাহেরআলি। নিজের রোগ যন্ত্রণাময় দুঃখ কষ্ট চেপে রেখেও আমিনাকে সামলাতে চেষ্টা করে সে। বেশী করে ভাবে বউ-এর কথা। হায়, বেচারীর দুঃখু কষ্ট সবই তো আমারই জইন্সে। আমিনার কোন সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারি নাই আমি। বাপ-মা মরা মেয়ে। ওর যে আর কেউ নাই এই দুনিয়ায়। বুক চেপে ধরে তাহেরআলি। যন্ত্রণাটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। হায় খোদা। এ কী হাল কইরলে। তাহেরআলি বুঝতে পারে—তার এ ব্যামো সাইরবে না। এতদিন রোগ ভোগের পর একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে সে।

আমিনাও আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না। দিনরাত দুর্ভাবনায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। কী করে যে এই মানুষটাকে নিয়ে কলকাতা যাবে! হাসপাতালে ভর্তি করবে? বড় ডাক্তার দেখাবে। দারুন সমস্যায় পড়ল আমিনা। তার মাথায় সর্বদাই একটি চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কলকাতা, হাসপাতাল, ডাক্তার। গজেন বদ্যি যত সহজে কথাগুলো বলেছে। কাজে অত সহজ নয়।

আবার ছুটে গেল আমিনা। গজেন বদ্যির পা দুটো জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করতে লাগল : মানুষটারে বাঁচাও ডাক্তার চাচা।

: আমার কাছে কাঁদলে কী হবে! ওকে হাসপাতালে নিয়ে যা। এখানে ওই কঠিন ব্যামো ভাল হবে না। গজেন বদ্যি যেন খ্যাক খ্যাক করে ওঠে।

: তাইলে তুমি একটু চলো আমার সাথে। মানুষটারে বাঁচাও ডাক্তার

চাচা। আমিনা আবার গজেন বদ্যির পা জড়িয়ে ধরে।

: আঃ কী বিপদ। গজেন বদ্যি পা সরিয়ে নেয়। ভারি আবদার। আমার যেন আর কাজ-কম্ম নেই। তোর সঙ্গে এখন আমি কলকাতা যাই। আরে বাপু হাসপাতালে নিয়ে গেলেই কি রুগী ভর্ত্তি করা যায়? যত সব। যা। যা। আমাকে এখন বিরক্ত করিস না। আমার এখন অনেক কাজ। গজেন বদ্যি মুখ খিচিয়ে ওঠে। আমিনা তবু আশা ছাড়ে না। সে অসহায় সুরে বলে: একটুখানি মেহেরবানী কর ডাক্তার চাচা। এই চরম বিপদকালে মানুষটারে বাঁচাও।

: কী জ্বালাতন রে বাবা। হাসপাতালে ভর্ত্তি কি এমনিতে হয়। টাকা খরচা করতে হয়। পারবি টাকা খরচ করতে। তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এতক্ষণে গজেন বদ্যি অনেক ফন্দি ফিকির করে টাকার কথাটা আমিনাকে শুনিয়ে দিল।

সহজ সরল চাষী বউ আমিনা। গজেন বদ্যির মত দালালকে চিনবে কেমন করে। আমিনা বিশ্বাস করে এসব কথা। তাই সে সহজ ভাবে শুধায়: কত ট্যাকা লাইগবে ডাক্তার চাচা।

টাকার কথা শুনে গজেন বদ্যির মুখখানা লোভাতুর হয়ে ওঠে। তাহলে টোপ গিলেছে। ধূর্ত শিয়ালের মত গজেন বদ্যির চোখ দুটো নেচে ওঠে। অবশ্য ভাব ভঙ্গিতে গাম্ভীর্য রক্ষা করে বলে: তা কম করেও শ'দুয়েক টাকা তো বটেই।

: দু'শ ট্যাকা! আমিনার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। এত টাকা সে পাবে কোথায়। বর্তমানে সংসার অচল। এই ক'মাস মানুষটার চিকিচ্চা পত্তরের খরচ জোগাতে যা নগদ কিছু ছিল সব শেষ। এমন কি ঘটিটা বাটিটা পর্যন্ত বেচতে হয়েছে। তার ওপর মহাজনের ঋণ, খাজনা-পত্তর, সব বকেয়া পড়েছে। শোধ করবার সাধ্য নেই। লাঙ্গল-বলদ একে একে সব বেচতে হয়েছে। এখন

বাকী এই ভিটেটুকু।

এই ভিটেটুকু আশ্রয় করে রোগা মানুষটাকে নিয়ে অনেক কষ্টে মাথা গুঁজে পড়ে আছে আমিনা। ছন্নছাড়া হাজার গণ্ডা চিন্তা-ভাবনা ভাবতে থাকে সে। কিন্তু হঠাৎ তার নাকের ফুলটার কথা মনে পড়ে যায়। যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একফালি বিদ্যুতের ঝিলিক।

বড্ড সোহাগের জিনিস এই রূপার নাকচাবিটা। বিয়ার রাইতে সোহাগ কইরে আমিনাকে পরিয়ে দিছিল মানুষটা। দু'চোখ ভেঙে জল আসে। মানুষটার এই কঠিন ব্যামো আমিনার সব সুখ সোয়াদ কেইড়ে নিছে। এ্যাদ্দিন এই চিহ্নটুকু অনেক কষ্টে বুকে আঁকড়ে রেখেছিল। কিন্তু না। আর ভাবতে পারেনা আমিনা। সে নাক থেকে খুলে ফেলে রূপোর নাকচাবিটা।

গজেন বদ্যির কাছে চলে আসে আমিনা। একান্ত বিপন্ন মনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আঁচল থেকে খুলে জিনিসটা রাখে গজেন বদ্যির সামনে।

: এই জিনিসটা রাকো ডাক্তার চাচা, তোমার কাছে রাকো। অনেক সাহসের সঙ্গে কথাগুলো বলে, আমিনা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে।

রূপোর একটুকরো নাকের ফুল দেখে গজেন বদ্যির ভ্রু কুঁচকে যায়; চোখে মুখে তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে।

: ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ এসব কী হবে? এই নাকচাবি নিয়ে আমি কী করব? না বাপু এসব ঝামেলা আমার পোষায় না। আমার এখন সময় নেই। গজেন বদ্যি উঠে পড়ে। আমিনার মুখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে। আমিনা অনুপায় হয়ে বলে: মেহেরবানী কর ডাক্তার চাচা।

: আবার কী ঝামেলা। এই সামান্য রূপোর নাকচাবিটা বেচে কি দু'শ টাকা পাওয়া যায় বাপু। যা, যা, এসব নিয়ে যা। টাকা জোগাড় করে নিয়ে আয়।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আমিনা, সে এখন কী করবে? হপ্তাখানেক হয়ে গেল ওষুধ-পথ্য বন্ধ। পথ্যটুকুও জোগাড় হচ্ছে না। মানুষটাকে বাঁচান যাবেনা। আমিনা কী করবে? কার কাছে যাবে? কোথায় গেলে টাকা পাবে। টাকার অভাবে বিনা চিকিচ্ছায় মানুষটা চোখের সামনে মরে যাবে? না। তা হতে পারে না। যে ভাবেই হোক কলকাতায় বড় হাসপাতালে মানুষটাকে নিয়ে যেতেই হবে। আমিনা কোন বাধাই মানবে না। টাকা জোগাড় করতেই হবে। যে ভাবেই হোক। অস্থির হয়ে ওঠে আমিনা। গজেন বন্থির কথাগুলো তোলপাড় করতে থাকে—টাকা নিয়ে আয়। সোয়ামীর ব্যামো ভাল করে দেব। কিন্তু আমিনা টাকা পাবে কোথায়? ফকিরআলির কথা মনে পড়ল। খুব ভাল মানুষ। এত বিপদের মধ্যেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিত। দুই দশ টাকা সাহায্য করত সময় সময়। এই মুহূর্তে ফকিরআলির কথা বারে বারে মনে আসে। কিন্তু বর্তমানে ফকিরআলির যা অবস্থা তাতে আর সেখানে হাত পাতা ঠিক হবে না। গেল সন বন্যায় মাঠে জল জমে ছিল। চাষ হয়নি। এক দানা ফসল ওঠেনি ঘরে।

হামেদ মিঞা। আবদুল। রেজাকআলি। এরা সকলেই তাহেরআলির বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু এদের কারোরই সাহায্য করার সামর্থ নেই। আমিনা তাই ওদের কাছে যেতে চায় না।

সব শেষে আজিম মিঞার নামটা মনে পড়তেই আমিনা কেমন যেন দমে গেল। বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল।

এ গাঁয়ের একজন সচ্ছল গেরস্থ আজিম মিঞা। ক্ষেত-খামার চাষ-আবাদ ছাড়াও লগ্নী পত্তর আর সেই সঙ্গে আছে বাজারে মুদি দোকান। বেচাকেনা ভাল। রোজগার ভাল। দু'চার পয়সা হাতে থাকে সর্বদা। অনেকেই ঠেকা-বেঠেকায় আজিমের কাছ থেকে সুদে ধার কর্জ নেয়। তাহেরআলিও মাঝে মধ্যে মুদি সওদা-পত্তর ধার বাকীতে নিত। সেই কারণে আজিমকে ভাল করেই জানে আমিনা। তবে

লোকটাকে ভাল ঠেকে না মোটেই। কেমন যেন কুতকুতে চাউনি লোকটার। লম্পট গোছের বদমাইসি চেহারা। আমিনার ভর ভরন্ত গতরটার দিকে আজিমের বরাবর লোলুপ চাউনি। আমিনা সহ্য করতে পারেনা এইসব বদ্-চরিত্তির মানুষগুলোকে।

রোগ-যন্ত্রণা কাতর তাহেরআলির আবার ককানি ওঠে। গলা থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। খক্ খক্ করে কাশতে থাকে। মানুষটার অসহায় অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। ব্যথা বেদনায় আমিনার মন কেঁদে মরে। আমিনার করুণ কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহেরআলি। বুকের মাঝে জমা হয়ে থাকা অনেক কথাই কইতে চায় তাহেরআলি। কিন্তু অত সব কথা কইবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই তাহেরআলির। শুধু মাত্র একটি শব্দ তাহেরআলির গলা থেকে বেরিয়ে এল : 'আমিনা'। সঙ্গে সঙ্গে আবার কাশি। 'আমিনা' শব্দটুকুর মধ্যে যেন অনেক কথা বলতে চায় তাহেরআলি। আমিনা সবই বোঝে, সবই জানে। মানুষটার অন্তরের আর্তনাদ সর্বদাই শুনতে পায় সে। আঁচলে চোখ মোছে আমিনা। অস্থির হয়ে ওঠে। বুকটা হাহাকার করতে থাকে। তাহেরআলির আকুল আর্তনাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে আমিনা। মানুষটাকে বাঁচাতেই হবে। কথাটা প্রতিজ্ঞার মত প্রবল বেগে তাড়িত করতে থাকে আমিনাকে।

সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আমিনা।

ছুটতে ছুটতে সে চলে আসে আজিম মিঞার কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আজিম মিঞা। পরক্ষণেই খুশিতে লাফিয়ে ওঠে সে। : আমিনা যে! কী ব্যাপার বল দিকিন। আজিমের চোখে সেই কুতকুতে চাউনির সঙ্গে মিচ্‌কি হাসি।

বেপরোয়া আমিনা। ভয়। ভীতি। লাজ-লজ্জা। সব হারিয়েছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল আমিনা। তারপর ধীর গলায় বলল : মানুষটার ভারি ব্যামো। হাসপাতাল নে যেতে হবে।

: তাইলে আর দেরী করছ ক্যানে।

: কিন্তু সামান্য কিছু ট্যাকা চাই যে। আমিনা কোন রকমে কথাটা বলে ফেলে নিতান্তই নিঃসহায়ের মত।

: তা আমি বুইঝতে পেরেচি। সব্বাই তো আমার কাছে ট্যাকার জন্যেই আসে। নইলে আমিনার দেখা পাওয়া কী চাট্টিখানি কতা। আজিম মিঞা আমিনাকে এত সামনাসামনি পেয়ে তার আপাঙ্গ লক্ষ্য করে। বুঝতে পারে দারুণ বিপদে পড়েই আমিনা তার কাছে এইয়েচে।

: বেশ তো দাঁইড়ে ক্যানে? চল ঘরের মধ্যে বইসবে চল। আজিমের গলায় মিহি সুর ফুটে ওঠে।

কোন কথা কানে নেয় না আমিনা। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে যেতে চায় না। তবু আজিমের মিষ্টি অনুরোধে আমিনা ঘরে যেতে বাধ্য হল।

ঘরের মধ্যে অন্য আর কেউ ছিল না। আজিম মিঞা আমিনার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে সেই কুতকুতে চাউনি। আজিমের চোখে চোখ পড়তেই আমিনার সবটুকু সাহস যেন মুহূর্তে উবে গেল। ভয়ে জড়সড় হয়ে সে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। আমিনার মনে হতে লাগল—সে যেন একটা মাছ ধরা জালের ফাঁদে হঠাতই আটকে গেছে। কিন্তু এভাবে এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। বাড়িতে রোগা মানুষটা একা পড়ে রয়েছে। কখন যে কী হয় বলা যায়না। আচমকা এক ঝড়ের দাপটে আমিনাব মন উথাল পাতাল করতে থাকে।

: তুমার কত ট্যাকা চাই বইললে না তো। আজিমের গলার স্বর কেমন অদ্ভুত শোনায়। আমিনা যেন কেঁপে ওঠে। আজিমের গলায় দরদ মেশানো সহানুভূতি অথবা ভনিতা বা ভণ্ডামি এসব কোনটাই বুঝতে পারে না আমিনা। ভয়ে জড়সড় নিরুপায় আমিনাকে দেখে আজিম আরো সহজ সরল হতে চেষ্টা করে। আমিনার আরো কাছে এগিয়ে আসে। সোহাগ করে বলে: কী গো, বল না ক্যানে, কত ট্যাকা চাই? অপলক তাকিয়ে থাকে আজিম। আমিনার ভরপুর যৌবন ভরা দেহটা থেকে যেন সবটুকু রূপ, রস, গন্ধ শুষে নিতে থাকে

আর সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। আমিনা যদিও ভরসা পায়না। তবু সে বলে : দু'শ ট্যাকা। গলার স্বরে অস্থিরতা।

: দু'শ ট্যাকা! আজিম কী যেন ভাবে। তারপর বলে : বেশ। তবে তুমি একটুকুন বসো। আমি এক্ষুণি দিচ্ছি।

ডেস্ক খুলে আজিম মিঞা টাকা বার করে। তারপর নোটগুলো আমিনার সামনে এগিয়ে ধরে বলে : নাও।

আমিনা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। আজিম টাকাগুলো গুঁজে দেয় আমিনার হাতে। বুক ধরপর করতে থাকে। আজিমের চোখে সেই কুতকুতে চাউনি। আমিনার কাছে আজিমের ভাবভঙ্গি ভাল ঠেকে না। কী যেন মতলব ভাজছে লোকটা। একটা অঘটন ঘটাতে চাইছে। সহজে এখান থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই।

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলা প্রায় শেষ। মাঠের সবুজে সবুজে সন্ধ্যা ছায়া নামে। গা শির শির করে ওঠে। তবু মানুষটাকে যেভাবেই হোক বাঁচাতেই হবে। আমিনার মন অস্থির তরঙ্গে দুলতে থাকে। মানুষটার রোগাক্রান্ত অসহায় মুখখানা চোখের সামনে বারে বারে ভেসে ওঠে। হপ্তাখানেক হইয়ে গেল একফোঁটা ওষুধ জুটে নাই। পেটেও ভাত নাই। এভাবে কী কইরে বাঁচবে মানুষটা।

এতক্ষণে আজিম মিঞা আমিনার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। কুতকুতে চোখে সেই লোভাতুর দৃষ্টি। আমিনার উপচে পড়া যৌবনের ছোয়ায় আজিমের নেশা চড়ে ওঠে। ভক্ ভক্ করে তাড়ির গন্ধ ছোটে। আজিম থলথলে ভালুকের মত গতরটা নিয়ে কুঁদতে থাকে।

পালাতে চাইছে আমিনা। যেভাবেই হোক পালাতে হবে। নইলে এই সর্বনাশা পরিণতির হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু আমিনা পালাবে কেমন করে? ঘরের দরজা বন্ধ। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। আমিনা নির্বাক। নীরব। নিরুপায়। আজিমের এতদিনের পাশবিক ইচ্ছাটা আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। একটা

ভাল্লুক দু'হাতে আমিনাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমিনা ভয়ে, দুঃখে, ঘৃণায় দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণ-পণ চেষ্টা করেও সে অব্যাহতি পায় না।

চেতনা প্রায় হারিয়ে ফেলে আমিনা। টলতে টলতে কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাড়ির পথে ছুটতে থাকে সে।

এতখানি বিপর্যয়ের মধ্যেও নিজেকে সামলে নিল আমিনা। সোয়ামীর কথা মনে পড়ল। আহা, মানুষটাকে এ্যাখুন হাসপাতালে নিয়ে যেতে পাইরব। বেচারীর ব্যামো ভাল হবে। আবার নিশ্চিন্দি মানুষটাকে নিয়ে ঘর সংসার পাইতব। সুখ, সোহাগ সব ফিরত পাব। আমিনার মন পরিতুষ্টিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

আর ছুটতে পারে না আমিনা। পা দুটো টলে। সারা দেহ দোলে। অবশ লাগে। সেই কখন থেকে সে ঘর ছাড়া। মানুষটা একলা পইড়ে আছে। কী জানি কত কষ্ট হইচ্চে।

সন্ধ্যা ঘন ঘোর। ঝাপসা পথঘাট। কানে বাজে ঝিঁ-ঝিঁ ডাক।

ঘরে ঢুকল আমিনা। সন্তর্পণে তাহেরআলির কাছে গিয়ে বসল। ডাকল। গায়ে হাত বুলোল। কিন্তু কোন সাড়া নেই মানুষটার। আবার ডাকে আমিনা। এবারেও কোন সাড়া শব্দ নেই।

চিতিয়ে পড়ে আছে তাহেরআলি। নিঃশব্দ। নিঃস্পন্দ। অসাড় দেহখানা ধীরে ধীরে নাড়া দিল আমিনা। নীরব মানুষটা নিঃস্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। পিদিমের পলতের আলো থিরথির কাঁপতে থাকল। এক সময় হঠাৎই নিভে গেল।

পাথুরে চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আমিনা। তাহেরআলির ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারল না সে। জোরে চেঁচাতেও পারল না। আমিনার গলা থেকে কিছুতেই কোন শব্দ বেরোল না।

পাঁচুর স্বপ্ন

পূবের আকাশটা ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে উঠেছে। মোরগের ডাক কানে আসছে—কুড়। কুড়। কু-ড়-ড়। ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

পাঁচুর ঘুম ভেঙে গেল। সে আড়মোড়া ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। পাশে আট-ন' বছরের ছেলে নারু শুয়েছিল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে ছেলেটার ঘুম জাঁকিয়ে এসেছিল। পাঁচু ছেলের দিকে তাকাল। আহা, মা-মরা ছেলেটা নিশ্চিন্দি ঘুমোচ্চে। পাঁচুর মায়া হল। সে ছেলেটার গায়ে মাথায় সোহাগ করে হাত বুলিয়ে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই পাঁচু ছেলেকে ডাকতে লাগল: নারু, উঠ বাপ, রাইত পুইয়েচে। ইবারে উঠ।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে পাঁচু। দেরী হয়ে গেলে আবার গালাগালি শুনতে হবে। গতকাল দেরী হয়েছিল বলে বেনীবাবু মুখ করেছিলেন। রোজ মজুরির পয়সা কেটে নিয়ে ছিলেন। তাই আজো আবার দেরী হলে হয়ত কাম জুটবেনা। ভয়ে ভয়ে পাঁচু ছেলেকে জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঘর থেকে কাস্তে আর নিড়ানী নিয়ে বাপ-বেটা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বড় সড়কে এসে উঠল। এখনো যেতে হবে খানিকটা। তারপর বেনীবাবুর ধান-জমি। নারু বাচ্চা ছেলে—ঘুমের নেশা তখনো কাটেনি। ছেলেটা নাকিসুরে ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতে লাগল।

: কাঁদিস না বাপ, কাঁদিস না। আর একটুকুন জোরে পা চালা। কাইলকের মত দেরী হয়ে পইড়লে আর কাম জুটবে না। বেনীবাবু

লুকটা মুনিষ্যি লয়। গরীব মানুষের দুঃখু মোটে বুঝে না।

হেমন্তের মাঠ জমিতে সোনা রঙ ধান লুটিয়ে রয়েছে। লগি মেরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে ধানের শীষে কাস্তে চালিয়ে রাতারাতি সাফ করে ফেলবে। চোরের উপদ্রব খুব বেড়েছে। তাই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। পূবের আকাশ আরো ফর্সা ঠেকছে। গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় শিশিরের ফোঁটা টুপ-টাপ ঝরে পড়ছে. ভোরের পাখিরা ঘুম ভাঙ্গানি গান গাইছে।

ওরা যখন জমির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, শুনতে পেল—বেনীবাবু বলছে : আমি সেই ভোর চারটে থেকে এসে বসে আছি। আর তোরা এলি এই এখন। দেখ দিকিন মাঠে সবাই কখন থেকে নেমে পড়েছে। পাঁচু দেখতে পেল—গগন, নেতাই, বংশী। ওরা সবাই জমিতে নেমে পড়েছে। ধান কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

পাঁচুকে তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেনীবাবু আবার মুখ খিচিয়ে ওঠে : বলি নবাব পুত্তুরের মত দাঁড়িয়ে থাকবি, না মাঠে নামবি। সঙ্গে মুনিষ আনতে বলেছিলাম, তা কী হল? আজকেও ওই পুচকে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিস। ও কি কাজ করতে পারে শুনি। খালি আছে ফাঁকিবাজির ফন্দি। আজ কিন্তু ওকে জল খাবারের পয়সা ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হবেনা।

ছেলেকে কাজে আনার ইচ্ছা পাঁচুর মোটেই ছিল না। কিন্তু যা সামান্য দিন-মজুরী পায় তাতে দিন চলে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই ছেলেটাকে সঙ্গে আনতে হয়। অতটুকু দুধের ছেলে বলে হাফ মজুরী-তো দূরের কথা, জল খাবারটুকুও রোজ পায় না ছেলেটা। তবু ছেলেটাকে সঙ্গে আনে পাঁচু।

জমিতে নেমে পড়ল পাঁচু। সঙ্গে ছেলেটাও আছে। মুখে কোন রা করে না সে। ছেলেটার জল খাবারটা যদি পাওয়া যায়। মা-মরা ছেলেটার জন্য দারুন দুঃখ হয় পাঁচুর। সখ ছিল ছেলেটাকে লেখা-পড়া শিখাবে। মানুষ করবে। বড় মানুষ। সমাজের একজন

গন্যিমান্যি লোক। লেখাপড়া না শিখলে ছেলেটারও হবে পাঁচুর মত এই দুর্দশা। মুনিষ খেটে খেটে আর বাবুদের কাছে, মহাজনদের কাছে মুখ খেয়ে খেয়ে পাঁচুর নিজের জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। সারা জীবনটাই এমনি করে মহাজনদের মার খেয়ে কাটাতে হবে। উঃ গরীব মুখ্যুসুখ্যু হয়ে থাকা। সত্যি সত্যি ভগমানের অভিশাপ। জমিতে কাস্তে চালাতে চালাতে এসব কথা ভাবে পাঁচু। ছেলে নারুকে নিজের সামনে রেখে কাজ শেখায়। মনটা টাটিয়ে ওঠে। গাঁয়ের পাঠশালায় ছেলেটাকে ভর্তি করে দিয়েছিল পাঁচু। পাঠশালার নরেন মাস্টারমশাই খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন: ভালকথা পাঁচু। তুমি ছেলেকে পড়াতে চাও। খুব ভাল কথা। আমরাও তো তাই চাই। ছেলেকে রোজ পাঠিয়ে দিও। আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না।

নরেন মাস্টার মশাইর কথাগুলো শুনে পাঁচু খুব উৎসাহ পেয়েছিল। একটা নতুন সাধ জেগেছিল। পাঁচু তার ছেলেকে পড়াবে। মানুষ করবে।

সহসা বেনীবাবুর হাক ডাক কানে যেতেই পাঁচু মুখ ঘোরাল। : তাড়াতাড়ি সবাই হাত চালিয়ে কাজ কর। আজকে সব ধান কাটা শেষ করতেই হবে। দু'দিনের জায়গায় তিনদিন হল। তোমরা বাপু আমার লোকসান করিয়ে দিচ্ছো।

বেনীবাবু পিটুলী গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা খাচ্ছিল। বেটে, খাটো, মেদবহুল চেহারার বেনীবাবু লোকটাকে হেমন্তের এই শুভ্র সকালে সূর্যের সোনা ঝরা রোদ্দুরে নিঃসন্দেহে বেমানান লাগছিল। যেন একটা বন্য বরাহ এতক্ষন ধরে নাসিকা গর্জন করছে।

জমির পাশে মেঠো কাঁচা রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত শুরু হল প্রতিদিনের মত। গোয়ালা। মাছওয়ালা। সবজি মাথায় চাষী। সবাই চলেছে সামনের হাটে। পাঠশালার ছেলেমেয়েরাও যেতে শুরু করল। এই পথ দিয়ে দল বেধে যাচ্ছিল ভানু, সতু, নীতু, হারু, পারু—

সব পাঠশালার ছেলেমেয়েরা, ওরা গাঁয়ের প্রাইমারী পাঠশালায় পড়ে। পাঁচু ওই পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা কেমন বই হাতে নিয়ে পড়তে চলেছে। আর নারু! ছেলেটার কথা ভেবে একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ছেলে নারুর দিকে তাকিয়ে থাকে পাঁচু। নাঃ পারল না পাঁচু। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারল না।

পাঁচুকে ওই পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বেনীবাবু আবার গলা খেকিয়ে ওঠে। : বলে ও পাঁচু, কাজ বন্ধ করে ওদিকে কী দেখছিস রে। ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করেছিলি শুনেছিলাম। তা পাঠালি না কেন পাঠশালায়। ছেলে 'নেকাপড়া' শিখবে, 'জজ ম্যাজিস্' হবে। বাঃ বাঃ। বেনীবাবুর ছোট ছোট চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে ওঠে।

পানের কষে ছোপ ধরা কালো কালো দাঁতগুলো বিটকেলে হাসি হাসতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভোঁতা নাকের পাটা ফুলে ওঠে। কপালের বলি রেখায় ভাঁজ পড়ে। তারপর কেশ বিরল টেকো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে: চাল নেই, চুলো নেই। আবার 'চৌকিদারী ট্যাক্স'। 'নেকাপড়া' করবে। সবাই যদি 'নেকাপড়া' করবি তবে জমির কাজ করবে কে! ওরে পাঁচু তোর ছেলেটা যে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজ না করলে কিন্তু জলখাবারের পয়সা দেব না।

পাঁচু দেখতে পেল—ছেলে সেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাঠশালার ছেলেরা যেদিকে যাচ্ছে নারু সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছেলের মনের সাধ আর নিজের মনের দুঃখু সব মিলেমিশে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। বেনীবাবু যখন কটমট করে ওদের দিকে তাকাল। ওরা বাপ বেটা তখনই যেন যন্ত্রচালিত মেসিনের মত জমিতে কাজ করতে লাগল।

বেনীবাবু আজ যেন রেগেই আছে। মেজাজটা তার সপ্তমে চড়ে আছে সেই সকাল থেকেই। : ওরে পাঁচু তোর পুচকে ছেলেটা হাঁ করে

দাঁড়িয়ে থাকে কেন রে। কাজে ফাঁকি। ছেলেকে এখন থেকেই ফাঁকি দিতে শিখিয়েছিস। পাঁচু দারুন দুঃখ পেল। সে নরম সুরে বলল: বাবু। মোরা সাতপুরুষ ধইরে তুমাদের গোলামী কইরে গেলুম, কামে ফাঁকি কারে কয় জানি না। এ্যাদ্দিন কেউ বদনাম দেয় নাই। তবে আজ তুমি আমাদিগে ফাঁকিবাজ কইলে। কী কইব বাবু। মোদের বড় দুঃখের কপাল।

* * *

কাজ যখন শেষ হল পশ্চিম আকাশে সূর্যি নেমে গেছে। পাখ-পাখালিরা কুলায় ফিরছে। পাকা ধানের আঁটি বোঝাই গরুর গাড়ি গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দেখে শান্ত-সোহাগ মাখা সুখানুভূতিতে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়।

সারাদিন মজুর খেটে যে ক'টা টাকা মজুরী পেল। তাই নিয়ে বাপ-বেটা দু'জনে বাড়ী ফিরল।

ফেরার পথে বাজার থেকে চাল, ডাল, ঝাল, নুন নিয়ে এসেছিল। তিনদিন রুটি আর পাটপাতা সেদ্ধ-খেয়েই কাটিয়েছিল ওরা। আজ একমুঠো ভাত পেটে পড়বে।

রাতের খাওয়া সেরে ক্লান্ত বাপ-বেটা ঘুমোতে গেল। এতক্ষণে তারা বিশ্রাম পেল। সারাদিন যেন লড়াই চলে। বেঁইচে থাকার লড়াই। এই গোটা জেবনডাই যেন লড়াই ক্ষেত্র। লড়াই কইরেই জেবনডা রক্ষা কইরতে হবে। এতসব চিন্তা পাঁচুর মনে কী করে যে এল তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

ভাবতে ভাবতে পাঁচু ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর একসময় সে স্বপ্ন দেখতে লাগল—পাঁচু তার ছেলেকে পাঠশালায় পড়তে পাঠিয়েছে। নরেন মাস্টার মশাই খুশি হয়ে বলেছেন: পাঁচু, তোমার ছেলেটির লেখাপড়ায় দারুন মাথা। এ ছেলে মানুষ হবে। এ ছেলে বড় হয়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

হঠাৎ পাঁচুর সাধের স্বপ্ন হারিয়ে গেল। পাঁচু তাড়াতাড়ি ধড়ফড়

করে উঠে পড়ল। বাইরে বংশীর গলা শুনতে পাও গেল। বংশী ডাকছে: পাঁচু। হেই পাঁচু। কামে যেইতে হবে। পাশের জমির মালিক ভবানীবাবু ডাইকতে পাঠিয়েছে। তাদের জমিতে কাজ কইরতে হবে।

কাল বংশীর সঙ্গে পাঁচুর কথা হয়েছিল। পাঁচু তাড়াতাড়ি ছেলে নারুকে ডেকে তুলতে গিয়েও ডাকল না। থাক। কচি ছেলেটাকে আর ডাইকব না। উকে আর মাঠের কাজে লাগাব না। এখুন থিকে উকে লেখাপড়া শিখাব। নরেন মাস্টার কইছেন: ছেলেকে ইস্কুলে পড়াতে আর মাইনা লইগবে না। সরকার থিকা নাকি ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের মাইনা, বইপত্তর, মায় জলখাবার পয্যান্তি সবকিছু সাহায্যি কইরতেছে। পাঁচুর মনে উৎসাহ জাগে। সে ছেলেকে রেখে একাই কজে যাবে মনস্থ করল। কিন্তু আবার বংশীর গলা শোনা গেল: পাঁচু। হেই পাঁচু। তাড়াতাড়ি কর। ছাওয়ালটাকে সঙ্গে লিয়ে আয়। কাজের চাপ খুব। উকেও হাফ মজুরী দেওয়া হবে। বাপ-বেটা ভাল পয়সা পাবি।

তাইতো ছেলেটাকে সঙ্গে নিলে কিছু বাড়তি পয়সা আইসবে। বাজারের ধার দেনায় মুখ দেখান মুশকিল। সবাই মুখ করে। যা-তা-বলে। আগের বকেয়া ধার দেনা শোধ না করতে পারার জন্য এখন আর কেউ পাঁচুকে ধার বাকি দেয় না। খাতির করে না। সবসময় কাজ-কম্ম জোটে না। হয়ত এই ক'মাস জমিতে ফসল কাটার কাজ আছে। এর পর আবার ঠায় ঘরে বসে থাকতে হবে। মাঝে মধ্যে কোন দিন জন মজুরী জুটলেও জুটতে পারে। কিন্তু তাতে পেট চলে না।

ঘুমন্ত ছেলে নারুর দিকে তাকায় পাঁচু। সহজ, সরল, আট/ন' বছরের ছেলে। রোগা চেহারা। আদুল গায় ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছে। পাঁচু ছেলের মাথায় হাত বুলোতে থাকে।

ও পাঁচু। কী হল তুমার। বেলা যে ঢের হয়ে যাচ্ছে। আমি

চইললাম, ছাওয়ালটাকে সঙ্গে লিয়ে এইস।

পাঁচু বংশীর ডাক শুনতে পেল। কোন উত্তর করল না। সে জানে ছেলেকে কাজে না নিয়ে গেলে বংশী রেগে যাবে। কারণ, পাঁচুর কাছে বংশী কিছু টাকা পায়। বংশী পাঁচুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই কারণেই বংশী পাঁচুকে বিশেষ বিরক্ত করে না। পথে ঘাটে সময় অসময় তাগাদা করে ফ্যাসাদে ফেলে না। কিন্তু টাকা যে তারও দরকার। সেওতো জন মজুর। দিন খাটা মানুষ। তারও ঘর সংসার ছাওয়ালপান আছে। পাঁচু জানে, সে যদি ছেলেকে সঙ্গে না নেয়, এই সুযোগ হাত-ছাড়া করে। তাহলে বংশী দারুন ক্ষেপে যাবে। অনেক চিন্তা চরিত্তির করে পাঁচুকে এখানে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে বংশী। বেশ কিছুদিন কাজ চলবে এখানে। তারওপর জমির মালিককে অনেক বলে কয়ে পাঁচুর এতটুকু নাবালক ছেলেটাকে কাজে নিতে রাজি করিয়েছে। হাফ মজুরিও আদায় হবে। ফলে পাঁচুর হাতে ছুটো বাড়তি পয়সা আসবে। বংশী তার বাকী পাওনাটা হয়তো পাঁচুর কাছ থেকে তুলে নিতে পারবে।

পাঁচু ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও বেরোয়নি। ছেলেটাকে সে কিছুতেই ডাকতে পারবে না। নরেন মাস্টারের পাঠশালায় নারুকে পাঠাবেই। ছেলেকে সে লিখাপড়া শিখাবেই। তার স্বপ্ন সাথক করে তুলবেই।

একাই বেরিয়ে পড়ল পাঁচু। গাঁয়ের মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল সে।

জমিতে এসে কাজে লেগে গেল পাঁচু। কাস্তে হাতে ফসল কাটতে লাগল।

কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে পাঁচু দেখতে পেল, বংশীর সঙ্গে নারু জমির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

: হেরে পাঁচু ছেলেকে তুই বাড়ি রেখে এইসেছিলি। এত করে বইলে এলাম তবু তুই ছেইলাটাকে সঙ্গে আনিস নাই! যাক গে। মুই

সঙ্গে কইরে লিয়ে আইলাম। জমির মালিক বাবুদের সঙ্গে মোর কথা হইয়েছে। নে, ছেইলাটাকে ইবারে কাজ দেখিয়ে দে।

ততক্ষনে বাচ্চা ছেলে নারু হাতে কাস্তে নিয়ে পরম উৎসাহে বাপের সামনে ধান কাটতে লেগে গেছে।

পাঁচুর মুখে কোন রা নাই। সে অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল ছেলে নারুর দিকে।

কাজ চলছে ব্যস্ত গতিতে। চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলো মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। সরকারী উদ্যোগে হাউসিং প্রবলেম সমাধানের সাক্ষ্য বহন করছে।

সাইটে প্রচুর মালপত্র—ইট। বালি। সিমেন্ট এবং লোহা-লক্কড় স্তুপীকৃত ছড়িয়ে রয়েছে। মিস্ত্রি-মজুররা কাজ করে চলেছে। কাজের গতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। কুলি মজুরদের সুবিধার জন্যে সিমেন্ট-বালি, ষ্টোন-চীপস মেশানোর আধুনিক মেসিনের আমদানি করা হয়েছে। শব্দ হচ্ছে—ঘড়। ঘড়। ঘ-ড়-ড়-ড়। কাজের মাঝে সর্দার। সুপারভাইসর এসে হানা দিচ্ছে। হাক-ডাক। চেঁচামেচি। মেসিন। যন্ত্রপাতির বৈচিত্র্যময় শব্দ। সব মিলিয়ে এক কর্মময় ব্যস্ততা।

কুলি-মজুরদের মধ্যে মেয়ে মজুরও আছে। ওরা সাঁওতালী মেয়ে। মরদ-মজুরদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে এরা।

মাথায় সিমেন্ট বালির কড়া নিয়ে ঝুমরি বাঁশের ভারা বেয়ে ওপরে উঠছে। জোর তাগিদ দিচ্ছে মিস্ত্রি। ঝুমরি আর পারছে না। সেই সকাল থেকে একটানা খেটে মরছে সে। এখনো জিরান মেলেনি মোটে।

হাউসিং এষ্টেটের বড় কর্তারা নাকি আজ উপস্থিত ছিল। তাই কনট্রাক্টর বাবুরা সর্বদাই দারুন ব্যস্ত।

ঝুমরি অতসব বোঝে না। সে কাজ পাগল মেয়ে। কাজ করা তার নেশা। তবে আজ সে হাঁপিয়ে পড়েছে। ক'দিন ধরে গতরটা গরবর করছে। কিছুতেই জুতসই ঠেকছে না। তবু তবিয়তকে তালিম না দিয়ে কাম করছে ঝুমরি। কিন্তু আর পারছে না। তার

অমন বাড়-বাড়ন্ত গতরটা যেন আর বইতে পারছে না। ঘাড় টন্ টন্ করছে। পা দুটো জরিয়ে আসছে। মাথা থেকে সিমেন্ট বালির কড়াটা নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। ভয় হয় সরদারের ধমকানিকে।

সরদারকে মনে পড়তেই ঝুমরির বুকের মাঝে ধড়াস, ধড়াস করে ওঠে। মুনিষ তো লয় জানোয়ার। ঝুমরি ভাল করেই জানে ধেনু সরদারটাকে। বেশ কিছুক দিন ধইরে পিছু লিয়েছেক বদমাইসটা। ছুঁচোর মত ছোঁকছোঁক করে সারাক্ষণ। ওই যে ইদিক পানেই আইসছেক ধেনু সরদারটা। ঝুমরি খানিকটা ঘাবড়ে যায়। সে বাঁশের ভারার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। বজ্জাতটা আবার পেছু লাইগবেক। ছল ছুতো করে শোনাবে সোহাগের কথা, পীরিতের কথা। কিন্তু ঝুমরি ভোলে না। সে জানে ধেনু সরদার একটা ধেড়ে ধান্দাবাজ। অনেক মেয়ে মজুরের ইজ্জত লিয়েছেক এই শয়তানটা।

ডোরাকাটা নীলাম্বরী শাড়িখানা ঝুমরির দেহের ভরপুর যৌবনকে সামাল দিতে পারছে না। বাঁধ ভাঙ্গা বুকের তরঙ্গ উত্তাল।

ধেনু সরদার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝুমরির দিকে তাকিয়ে থাকল ক্ষেপা কুকুরের উন্মত্ত দৃষ্টি নিয়ে। যত দেখে ততই সরদারটার নেশা বেড়ে যায়। সে ঝুমরির আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : দে, কড়াটা মুর হাতে দে। ইবার তু একটুক জিরিয়ে লে যা।

ঝুমরি দারুন ভীত হয়ে পড়ল। এবং লক্ষ্য করল—সরদারের রক্তবর্ণ চোখ দুটো ঝুমরির সারা গতরটা গ্রাস করতে চাইছে। ধেনু সরদারকে ভাল করেই চেনে ঝুমরি। ওদের দলের অনেক মেয়ে মানুষের ইজ্জত লিয়েছেক এই ধেনু সরদারটা। একগাদা ঘৃণা ঝুমরির মনে দগ্ দগ্ করতে থাকল। তবু সে সরদারটার কথায় সারা না দিয়ে ভারা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

ক্ষেপে গেল সরদারটা। রক্তবর্ণ চোখ দুটো তার আরো রাঙ্গা

হয়ে উঠল। মুখের আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল: তুকে মুই দেখে লিব। সরদারটার খ্যাক খ্যাক গলার শব্দটা ঝুমরির কানে আছড়ে পড়ল। ভয় বাড়তে লাগল।

ছেলিয়াটার জ্বর। নিজের গতরটাও বেগতিক। ছেলের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল। ঝুমরির মনটা সেই মুহূর্তে টন টন করতে লাগল।

কিশোরী বয়েসে সাদি হয়েছিল ঝুমরির। সোয়ামীটা বহুত ভাল মানুষ ছিল। কিন্তুক কপালে সইল না। সোয়ামীর সোহাগ ভালবাসা ঝুমরির ভোগে টিকল না। হঠাৎ বাণ-বেঁধা পাখির মত ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তিন দিনের জ্বরে ভুগে বেঘোরে মারা গেল মানুষটা। সেই মানুষটার এতটুকুন চিহ্ন এই বছর আষ্টেকের বাচ্চা ছেলিয়াটার জইন্যেই দেওয়াই লিতে হবেক।

হপ্তা মিললে ডাগদারকে ট্যাকা দিতে হবেক। নইলে দাওয়াই মিলবেক নাই। ভাবতে ভাবতে ঘাবড়ে যায় ঝুমরি। আজ যদি হপ্তা দিতে হয়রানি করে সরদারটা।

জগুর কথা মনে পড়ল। জোয়ান মরদ জগু। ঝুমরির সঙ্গে মজুর খাটত। এখানেই ওরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করত। ঝুমরির থেকে জগু বছর পাঁচেক ছোট হলেও ওদের দু'জনকে বে মানান ঠেকত না। ঝুমরির আঁটসাট দেহের ঢলের কাছে জগুর জোয়ান তাগড়াই চেহারাটা জব্বর মানিয়েছে। ঝুমরিকে জগু সাদি করবে। এ কথাটা ভাবতেই ঝুমরির ডাগর ডাগর চোখ দু'টোতে রঙের রোশনাই লাগে। দিল খুশি হয়। আবার ঘর বাঁইধবে ঝুমরি। ছোট্ট ছেলিয়াটারে সুখে সোয়াস্তিতে মানুষ কইরবে।

কিন্তু সেই পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল ধেনু সরদারটা। সে জগুকে একদম বরদস্ত করত না।

শালা মোর সুমুখে ঝুমরিকে লিয়ে ফুর্তি কইরবে। তা হবেক নাই। ধেনু সরদারটা বুনো শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করত।

শেষে একদিন গুঁতোগুঁতি লেগে গেল। বে-ধরক মার মেরে জগুকে এখান থেকে তাড়াল সরদারটা। জগু পালিয়ে বাঁচল।

তবু মাঝে মাঝে জগু আসত। লুকিয়ে লুকিয়ে ঝুমরির সঙ্গে দেখা করত।

কিছুদিন বাদে বড় একটা কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিল জগু। কুলির কাজ। আজ আসবে সে, কাজের শেষে ঝুমরির সঙ্গে দেখা করবে। অনেক কথা হবে। সোহাগের কথা। পীরিতের কথা। দরদের কথা।

কড়াভর্তি মশলা মিস্ত্রির সামনে রেখে বাঁশের ভারা বেয়ে নামতে লাগল ঝুমরি। ওর চনচনে মন আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।

আজ হপ্তার টাকা হাতে পেলেই ঝুমরি পালাবে এখান থেকে। ধেনু সরদারটার কবল থেকে ছাড়ান পাবে ঝুমরি। জগুকে নিয়ে আবার মনের সাধে ঘর বাঁধবে সে। অঢেল আশা—আনন্দে ঝুমরির বুকটা ভরপুর হয়ে উঠতে লাগল।

বেলা পড়েছে। সূর্যি বাড়ির ছাদের আড়ালে নেমে গেছে।

বাঁশের ভারা বেয়ে ঝুমরি নামতে লেগেছে। জগু আইসবে। একটু বাদেই সে আইসবে।

হপ্তার টাকা তোলা হয়ে গেছে। টাকা তোলার সময় সরদারটা চোখ পাকিয়ে ঝুমরিকে দেখছিল। কী যেন বিড়, বিড় করে বলছিল। ঝুমরির খুব ডর লাগছিল। কী জানি, বদমাইসটা কখন কী কইরে বইসবে। ভাবনায় ভারি ঠেকে বুক। মলিন লাগে মুখ। এত সুখ কী ঝুমরির নসিবে সইবে? জীবনের তিরিশটা বছর কেইটে গেছে সেই দুঃখু কষ্টের সঙ্গে লড়াই কইরে। ওই একরত্তি ছেলিয়াটারে বুকে ধইরে সব কষ্ট ভুলতে চেয়েছিল ঝুমরি। কিন্তুক কুথা থিকে এইসে জুটল জগু। জুগুটা ঝুমরিকে সত্যি সত্যি দুব্‌ল্যা কইরে ফেইলেছে।

জগুর কাছে ঝুমরির কড়া শাসনের বেড়া ভেঙে গেছে। শক্তি, সামর্থ, সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে ঝুমরি। যে সাহসের জোরে ধেনু

সরদারের মত বদমাইসকে এতদিন ঝুমরি সামাল দিয়েছিল। কিন্তু আজ ঝুমরি সব হারিয়েছে। জগুর কাছে সে সত্যিই হারিয়ে গেছে।

ঝুমরির অস্থির চোখ দুটো সাইটের চতুর্দিকে জগুকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু জগুকে কোথাও দেখা গেল না। জগু আইসছে না ক্যানে? ঝুমরির মনের মধ্যে কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল।

কথা দেওয়া ছিল কাজের শেষে জগু আসবে। ঝুমরিকে নিয়ে যাবে। এখানে আর কাজ করতে দেবে না ঝুমরিকে। ধেনু সরদারের কবল থেকে ঝুমরিকে উদ্ধার করবেই। সেদিন জগু ঝুমরিকে সেই কথাই বলেছিল। ইখান থিকে তুকে লিয়ে যাবই রে ঝুমরি। তুই কুচ্ছু ভাবিস না। জগুর কথাগুলো বারে বারে ঘুরপাক খেতে লাগল। ঝুমরি ব্যস্ত হয়ে উঠল। এখুনো ক্যানে আইসছে না মানুষটা।

সন্ধ্যা ঘোর। শীতের কুয়াশায় আচ্ছন্ন চতুর্দিক। সাইটে সরকারী আলো নিষ্প্রভ। ঝুমবি আর ধৈর্য রাখতে পারে না। তবু সে অপেক্ষা করতে লাগল। ঝুমরি জানে—জগু আসবেই।

* * *

কারখানায় কাজ চলছে।

কুলিরা কাজ করছে। লোহা, লক্কড় টানা হিঁচড়া চলছে।

লোহা গালাই। ঢালাই। রেলের চাকা। বীম। বগী তৈরী হয় এখানে। জগু এই কারখানায় কাজ করে। জোয়ান মরদ জগু। খোশ-মেজাজে কাম করছে। নতুন কাম। বহুত খুশি সে। ঝুমরিকে মনে ধরেছে। ঘর বাঁধবে। সন্সার করবে। উদম নেশায় মেতে ওঠে জগু।

শালা ধেনু সরদার বদমাইস। উখান থিকে ঝুমরিকে জলদি লিয়ে আইসতেই হবেক। জগু আজই ঝুমরিকে লিয়ে আইসবে।

ফুর্তিতে কাম করছে জগু। ওভারটাইম খাটবে না সে। সময় নেই।

সাঁঝের বেলা ঝুমরির কাছে যেইতে হবেক। উকে লিয়ে আইসতে

হবেক। ঝুমরি সিখানে দাঁইড়ে থাইকবে।

কাজ চলছে পুরো দমে। দ্রুত গতিতে।

কিন্তু জগু কামে মন লাগাতে পারছে না। সে ছট্‌ফট্‌ করছে। কখুন পালাবে ইখান থিকে। ঝুমরির কাছে এক্ষুনি যেইতে হবেক।

সরদার সুপারভাইসর তাড়া দিচ্ছে। জলদী কর। জলদী কর। কাম উঠাও। বহুত জলদী কাম উঠাও।

কারখানার ছুটির ভোঁ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জগু যেতে চেয়েছিল। কিন্তু জগুকে যেতে দেওয়া হয়নি। কাজের চাপ পড়েছে। জরুরী কাজ। আজই সব মাল ওয়াগন বোঝাই করতে হবে। সুতরাং জগুর ছুটি মেলেনি। যেখানে মুনাফা বড় সেখানে মানুষের মনের দাম নেই। মালিকের চাপে জোর-জবরদস্তি কাম করতে হচ্ছে। জগুর মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে। কামে মন লাগছে না মোটেই। তবু জগুকে কাম করতে হবে।

সাইডিং এ জমিয়ে রাখা বীম। বরগা। লোহার চাকা। ওভারহেড ক্রেনের সাহায্যে ওয়াগন থেকে ওঠান নামান হচ্ছে। ক্রেনের হোল্ডারে শিকল বাঁধা লোহার বীমগুলো বগীতে তোলা হচ্ছে। ক্রেন চলছে, শব্দ উঠছে—কড়। কড়। ক—ড়—ড়।

কিন্তু ঘটল অঘটন। ক্রেনের শিকল হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোহার ভারি বীমগুলো ছিট্‌কে পড়ল। নীচে কুলি-কামিনরা কাজ করছিল। ঠিক সেখানেই। সামাল। সামাল। ভয়ার্ত চিৎকার। চেঁচামেচির শব্দ উঠল। কয়েক মুহূর্তে ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত অঘটন। কুলিরা পালাবার সময়ও পেল না। মরণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর সব শেষ।

মস্ত লোহার বীমটা কুলিটার ঘাড় সোজা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছিল কুলিটা।

সবাই ছুটে এল।

তখনো ভারি লোহার বীমের তলায় পড়ে আছে সেই কুলির অসাড়

দেহটা। সবাই মিলে ধরাধরি করে বার করে আনল জগুর মৃতদেহটা। মাথাটা একদম থেত্‌লে গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর বিভৎস দৃশ্য। জগুকে সহজে কেউ সনাক্ত করতে পারবে না।

অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া এমন মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র জানতেও পারল না ঝুমরি। সে তখনো অসীম ধৈর্য নিয়ে জগুর জন্য অপেক্ষা করছিল। বুকে তার আশা-অকাঙ্ক্ষার উথাল পাথাল ঝড় বইছিল। জগু আইসছে না ক্যানে? কথা দিয়ে তবু আইসছে না ক্যানে? ঝুমরির বহুত গোসা হতে লাগল। রাইত হইয়ে গেল, মানুষটার তবু দেখা নাই। আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল ঝুমরি।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ঝুমরি। জগুর কথাগুলা তার অস্থির চঞ্চল বুকের মাঝে হালকা পালকের প্রলেপ মাখাতে থাকল। : তুই কুচ্ছু ভাবিস না ঝুমরি। ইখান থিকে তুকে জলদি লিয়ে যাব।

আবার খুশির আমেজে মশগুল হয়ে ওঠে ঝুমরি। জগুর সঙ্গে যাবে। ঘর বানবে। সুখে-সোয়াস্তিতে সন্‌সার সাজাবে।

এক বুক আশা নিয়ে মুঠো মুঠো মুহূর্তগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে ঝুমরি। জগু আইসবে। আইসবে। জরুর আইসবে।

পশ্চাৎ ভূমি

শিয়ালদা ষ্টেশনের গেটের সামনে এসে বিমল হাত ঘড়িটা দেখে নিল। চারটে পনের। গাড়ি ছাড়তে পনের মিনিট এখনো বাকি।

ইউনিয়ন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল বিমল। কী সব জরুরী কাজ আছে হাতে। সুতরাং অন্য কোথাও দেরী না করে বিমল সোজা চলে এল ষ্টেশনে।

কল্যাণী লোকালে উঠতে হবে। কিন্তু গাড়িতে দারুন ভিড়। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য গাড়ি ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছিল।

প্লাটফর্মে যাত্রীদের ভিড় জমে গেছে।

গাড়ির গেটের মুখে মানুষ জীবন বাজি রেখে ঝুলছে। বিমলও অনেক কষ্টে গেটের রড ধরে ঝুলে পড়ল! কোন রকমে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ঠেকান গেল।

গাড়ি ছাড়ল।

বিমল অনেক কসরত করে কামরার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। ভিতরে অসম্ভব গরম। ভ্যাপসা গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুকে হাঁপ ধরে। বিমলের সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে। পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক হাতে ঝুলন্ত হাতল ধরা। অন্য হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ক্লান্তিতে ভদ্রলোকের মাথাটা যীশুর মত ঈষৎ ডান দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চোখ দুটো ঘোলাটে। কণ্ঠ-নালীর শিরা কাঁপছে। বিমল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বারে বারে দেখছিল।

এত ভিড়ের মধ্যেও হকারদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ধূপকাঠি চাই ধূপকাঠি। আমলকী খাবেন আমলকী। বাদাম চাই বাদাম। হকারদের চিৎকারগুলো যেন আর্তনাদের মত শোনা যাচ্ছিল।

পরপর কয়েকটা ষ্টেশন থেমে থেমে এল গাড়ি। যাত্রীরা ওঠা নামা করল। গাড়ির মধ্যে কিছুটা জায়গা খালি হল।

বারাকপুর ছাড়িয়েছে গাড়ি। বিমল বসল।

বেলা গড়িয়ে বিকেলে পৌছেচে। তবু পশ্চিমের পড়ন্ত রোদের তেজ কমেনি। চৈত্রের মাঝামাঝি। এসময় খরায় খটখটে জমি। সবুজে হলুদ ছোপ। গাছ-গাছালির ঝরা পাতার খসখসানি। দূরে মাঠে খড় বোঝাই গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। জানলার দিকে মুখ করে বসেছিল বিমল। চলমান দৃশ্যগুলো ছুটছে। শহরতলীর কলকারখানার আকাশ ছোঁয়া চিমনিগুলোর মুখ থেকে ধোঁয়ার রাশি আকাশের নীলে মিশে যাচ্ছে।

হঠাৎ গাড়িটা ব্রেক কসে থেমে গেল। যাত্রীরা পরস্পরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিমল টাল সামলাতে না পেরে একজনের গায়ের ওপর পড়ে গেল। সেই মুহূর্তে কানে ভেসে এল—অ্যাকসিডেন্ট। গাড়ি থেমে গেল। সামনেই শ্যামনগর ষ্টেশন। যাত্রীরা অনেকেই নেমে পড়ল। বিমলও নামল।

রেল লাইনে ভিড় জমেছে। পাথুরে খোয়ার বুকের মাঝে রেল লাইন। সর্পিল গতিতে চলে গেছে। সেই লাইনের পাশে যাত্রীদের জটলা। বিমল ঢুকে গেল সেই জটলার মধ্যে।

একটি মহিলার মৃতদেহ। পাশেই প্রায় বিশ কেজি ওজনের একটি চালের ব্যাগ। ছিটকে পড়ে আছে। লাইনের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গাড়ি ধরবার চেষ্টা। বিমল আরো কাছে এগিয়ে গেল। ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি ভাল করে লক্ষ্য করল সে। রেলে কাটা পড়া আরো দু'একটা ঘটনা বিমলের চোখে পড়েছে। কিন্তু এমন মর্মান্তিক দৃশ্য ইতিপূর্বে আর দেখেনি বিমল। সেই কারণেই বোধ হয় বিমল এত সহানুভূতিশীল। নইলে অন্যসব যাত্রীদের মত সেও মুখে আহা, উহু অথবা ঈশ। এই ধরনের অনুশোচনা সূচক শব্দ প্রয়োগ করে চলে যেতে পারত। কিন্তু বিমল গেল না।

বিকেলের শেষ রোদটুকু তখনো বিদায় নেয়নি। দিগন্তে লাল-হলুদের মেশামেশি।

মৃত মহিলাটি বিবাহিতা। সিঁথিতে সিঁদুরের ছোপ। বয়েস তিরিশের নীচে। মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করতেই বিমলের নজর স্থির হয়ে গেল। সে চিনতে পারল মহিলাটিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল চাঁপা বৌদিকে। এইতো সেদিন—মুহূর্তে বিমলের চোখের সামনে ভেসে উঠল চাঁপা বৌদির মুখখানা। : আরে বিমল ঠাউরপো যে, আসেন গো আসেন। চাঁপা বৌদি বিমলকে দেখেই ঘর থেকে একখানা আসন এনে পেতে দিয়ে বলল : বসেন।

ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে সুনাম আছে বিমলের এ তল্লাটে। সব পাড়াতেই খাতির পায় বিমল।

: এখন বসতে পারব না বৌদি। একটু ব্যস্ত আছি। বলেই বিমল ফাইল-ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে বলল : এই টাকাটা রাখুন। চাঁপা বৌদির দিকে খামটা এগিয়ে ধরল বিমল।

চাঁপা বৌদি আপত্তির সুরে বলল : আবার টাকা! আর কত কইরবেন আমাদের জন্যি। আপনাদের সাহায্যিতেই আমরা বেঁইচে আছি। চাঁপা বৌদির গলায় কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল।

: আপনাদের এই বিপদে আমি আর কতটুকু করতে পারছি। আমি তো শুধু পার্টির সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এনে আপনাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছি বৌদি।

: আপনার ঋণ আমরা জেবনে শোধ করতি পারব না বিমল ঠাউরপো। চাঁপা বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলার স্বর নামিয়ে আবার বলল : বিমল ঠাউরপো, আপনারে একটা কথা কব ভাবছি।

: বলুন বৌদি। বলুন। বিমল সহানুভূতির সঙ্গে বলল।

: কিছু মনে কইরবেন না বিমল ঠাউরপো।

বিমল লক্ষ্য করল—চাঁপা বৌদি তার বক্তব্য সহজে বলতে পারছে না। বলতে যেন কুণ্ঠা বোধ করছে।

চাঁপা বৌদিকে সাহস দিয়ে বিমল আবার বলল : বলুন বৌদি ! যা বলতে চাইছেন বলুন। আমার কাছে আপনার কোন সংকোচ নেই।

: হ। বিমল ঠাউরপো। আপনার কাছে সেই জন্যেই সব কইতে চাই। আর আমাদিগের সাহায্য লাইগবে না।

বলে কী চাঁপা বৌদি। বিমল অবাক হয়ে যায়। যার স্বামী ছ' মাসের ওপর কঠিন রোগে শয্যাগত। উপার্জনহীন। সংসার অচল। চারটি প্রাণী প্রায় না খেয়ে দিন কাটায়। এই চরম অবস্থার মধ্যে থেকে চাঁপা বৌদি এসব কী বলছে। বিমল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাই সে গলা নামিয়ে বলল : কেন বৌদি। ভোলা দা সাহায্য নিতে বারণ করছে ?

: না বিমল ঠাউরপো। উনি মানা করে নাই। চাঁপা বৌদি চুপ করে রইল।

বিমল বুঝতে পাররল—চাঁপা বৌদির সম্মানে লাগে। সে চায়না এভাবে দিনের পর দিন হাত পেতে সাহায্য নিতে। কিন্তু কী করে চলবে এদের ? বিমল কিছুই ভেবে স্থির করতে পারে না যে, কোন ভরসায় চাঁপা বৌদি সাহায্য নিতে নারাজ।

বিমলকে নীরব থাকতে দেখে চাঁপা বৌদি বলল : বিমল ঠাউরপো বোধ করি ভাইবছেন। আমাদের কী কইরে চলবে ?

: হ্যাঁ, ঠিক তাই।

: সে ব্যবস্থা আমি আগেই কইরেছি। চাঁপা বৌদি বিমলের কৌতুহল আরো বাড়িয়ে তোলে। সামান্য গেরস্থ ঘরের বৌ চাঁপা বৌদি। লেখা পড়া জানে না। কী এমন ব্যবস্থা করছে সে, যাতে রুগ্ন স্বামী, ছোট দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই সংসার সামাল দেবে।

: চালের ব্যবসা করছি বিমল ঠাউরপো। হাতে লুকোন কিছু টাকা ছিল। সেই টাকা দিয়ে চালের কাজ শুরু কইরেছি। যা উপায় হয় তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চইলে যাবে বিমল ঠাউরপো।

তবে ই-সব কথা আপনার ভোলা দা যেন কোন মতে জানতি না পারে। তাহলেই সব্বনাশ।

ঃ কেন বৌদি ?

ঃ না বিমল ঠাউরপো। উনি জানইতে পাইরলে আমারে আস্ত রাইখবে না। জানেন তো—কেমন জেদী মানুষ। চাঁপা বৌদি সোয়ামীর ভয়ে গলা নামিয়ে কথাগুলো বলল।

বিমল সব শুনে বললঃ ঠিক আছে বৌদি। আজকে চলি। এখুনি দক্ষিণ পাড়ায় যেতে হবে। সেখানে একটা মিটিং আছে।

চাঁপা বৌদি সংসারের টুকিটাকি কাজ গোছাচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দিল। ভোলাদার জন্য খাবার যোগাড় করল। বোধ হয় এখুনি তাকে খাইয়ে দিতে হবে। তারপর আবার রাতের গাড়িতে বেরোতে হবে। পরের দিন সকালে চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবে। সেই চাল বৈঠকখানা বাজারে বেচতে হবে।

ভোলা মিস্ত্রীকে চাঁপা বৌদি দারুণ ভয় করে। সোয়ামীকে ফাঁকি দিয়ে চাঁপা বৌদি এত সব করছে, রোগা মানুষটাকে সে কিছুই জানতে দিতে চায় না। মানুষটা একটু আরামে থাকুক। ভাল কইরে সেইরে ওঠুক।

শ্যামনগর জুট মিলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করত ভোলা মণ্ডল। ভাল মাইনে পেত। সুখের সংসার ছিল। চাঁপা বৌদি সোয়ামীর সোহাগ, সুখ সবই পেয়েছিল। কিন্তু কপালে সইল না।

কাজ পাগল মানুষ ভোলা মিস্ত্রি। ইউনিয়নের ভাল কর্মী শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ছাঁটাই হয়েছিল ভোলা মিস্ত্রি। ছাঁটাইর পর থেকেই ভোলা মিস্ত্রির সংসার অচল। তারপরেই পড়ল অসুখে। কিন্তু ভোলা মিস্ত্রি নিজের জন্য কখনো মুখ ফুটে চাইবে না কিছু। হাত পাততে পারবে না কারুর কাছে। বিমল ভালো করেই জানে ভোলা মিস্ত্রিকে। অনেকদিন থেকে এক সঙ্গে ইউনিয়নের কাজ করছে দু'জনে। সুতরাং ভোলা

মিস্ত্রির রগ চেনে বিমল। সেই কারণেই বাধ্য হয়ে ভোলা মিস্ত্রির সংসারের দায়িত্ব বিমলকেই নিতে হয়েছিল।

আর একদিন কী এক বিশেষ কাজে গিয়েছিল ভোলা মিস্ত্রির বাড়ি।

বিমল ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল—ভোলা মিস্ত্রি একটা তক্তপোশের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে। সামনে চাঁপা বৌদি ভাতের থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। করুণ মুখে অনুনয় করে বলছে : ভাত এইনেছি, খেইয়ে নাও।

ভোলা মিস্ত্রি যেন শুনতে পাচ্ছে না। চাঁপা বৌদি আবার ডাকছে : উঠে বসে খেইয়ে নাও। ভাত এইনেছি।

: না, খাব না। ভোলা মিস্ত্রি মুখ খিচিয়ে ওঠে। আমার সামনা থিকে তুই চইলে যা। ও ভাত আমি খাব না।

: ক্যানে। আমি কী কইরেছি।

চাঁপা বৌদির গলায় করুণ আকুতি ফুটে উঠল।

: আবার মুখে মুখে কথা, সারাদিন রাইত আমি একলা পইড়ে থাকি। একবারটি কাউকে ডেইকে পাইনা। কে কোথায় থাকে কোথায় যায়। কিচ্ছু জানি না। আর এখন এইয়েচে সোহাগ দেখাতি। যা। আমার সুমুখ থিকে যা। তোর মত মেইয়ে মানষের সঙ্গে আমি ঘর করতি চাই না।

ভোলা মিস্ত্রি উত্তেজনায় উঠে বসল। এবং কাশতে লাগল। চাঁপা বৌদিও মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিমল এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিল। ওরা কেউ বিমলকে দেখতে পায়নি।

ভোলা মিস্ত্রি উঠে বসতেই বিমল তার চোখে পড়ে গেল।

: এই যে বিমল ভাই এইয়েচ। আজকাল তোমাকেও তেমন দেখতি পাই না। একে একে তোমরা সবাই আমাকে ছেইড়ে পালাচ্ছ।

: সেকি ভোলা দা। আমি তো মাঝে মাঝে আসছি। হ্যাঁ, ভাল কথা। তোমার জন্যে হাসপাতালের চেষ্টা করছি। বোধ হয় হপ্তা খানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিমল ভোলা মিস্ত্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। চোয়াড়ে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোঁঠরাগত চোখ জোড়া ঘোলাটে। সেই চোখ আর নেই। আছে অস্থি-চর্ম সার একখানা কাঠামো। কত অবসন্ন। অসহায়।

তবু ভোলা মিস্ত্রি প্রতিবাদ করে ওঠে। : না। আমার জন্যি কারও কিছু করতি হবে না। আর আমি বাঁচতি চাই না।

বিমলের দুঃখ হয়—ভোলা মিস্ত্রির মত মানুষ আজ কী অবস্থায় পড়ে আছে। বিমল সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল : অস্থির হলে অসুখ বেড়ে যাবে ভোলাদা।

: বাড়ুক। আমি মইরলে কার কী বিমলভাই। মেইয়ে মানুষ এত বেইমান হয়। সারাদিন একলা পইড়ে থাকি। এমন কী ছেইলে মেইয়ে দুইটাকেও দেখতি পাই না। এই ব্যামোতে পইড়ে আমি সকলেরে চিনেছি।

বিমল ভোলা মিস্ত্রির মনের অবস্থা অনুভব করে।

: আজ অসুখে পইড়েছি। মিল থিকে ছাঁটাই হইয়েছি। হাতে পয়সা নাই। দেহে সামর্থ নাই। সেই জইন্যেই আজ আমি সকলের কাছে এত ঘেন্নার পাত্তর। ভোলা মিস্ত্রি আবার কেশে উঠল—খক। খক। খক। কাশি থামতে আবার বলল : বল বিমল ভাই, তুমিই বল। এই চাঁপার জন্যি। এই সংসারের জন্যি। আমি কত কইরেছি। কিন্তু আজ আমাকে কেউ দেখতি পারে না।

বিমল ভোলা মিস্ত্রির কথাগুলো শুনল কিন্তু কোন বাধা দিল না। সে জানে—বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। রোগে ভুগে ভুগে ভোলা মিস্ত্রির মনেও রোগ ধরেছে। সে এখন সংসারের সবাইকে ভুল বুঝছে। তবু বিমল ভোলা মিস্ত্রিকে অনেক বোঝাল। কিন্তু ভোলা মিস্ত্রির ভুল ভাঙান গেল না। চাঁপা বৌদির বারণের জন্য বিমল ভোলা

মিস্ত্রিকে কিছুতেই বলতে পারল না।

বাচ্চা ছেলে মেয়ে দুটি হয়ত অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করছে। কখন মা বাড়িতে ফিরবে।

ভোলা মিস্ত্রির জন্য সমবেদনা জাগে। বেচারি কোনদিনই তার স্ত্রীকে বুঝতে চেষ্টা করল না। ভোলা মিস্ত্রির কাছে চাঁপা বৌদি চিরদিনের মত অপরাধী হয়েই রয়ে গেল।

চাপা বৌদি সংসারের জন্য। রুগ্ন শয্যাগত স্বামীর জন্য যে কঠিন সংগ্রামে নেমেছিল, সে খবর হয়ত কেউ জানল না।

মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সেই দৃশ্য। পশ্চিম দিগন্তে বিদায়ী সূর্য। ফিকে সিঁদুরে রঙে বিষণ্ণ ছায়া। রেল লাইনের পাথুরে খোয়ার মাঝে তখনো চাঁপা বৌদির অসাড় মৃতদেহটি পড়ে আছে।

বিমলের ব্যথাতুর মনে এক করুণ আর্তনাদের সুর বাজতে লাগল।

ভর দুপুরে সূয্যি মাথায় নিয়ে নকুল জমির আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাকুড় গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। খটখটে খরায় ক্ষেত-খামার শুকিয়ে কাঠ। যতদূর চোখ যায় এবড়ো খেবড়ো হতশ্রী চেহারা।

নকুলের সারা গায়ে ঘাম্ গড়ায়। পা টনটন করে। একটু জিরিয়ে নিলে হয়। পাকুড় গাছটার গোড়ায় বসে পড়ল নকুল। গামছায় গা-গতরের ঘাম মুছল। ট্যাঁকে গোঁজা বিড়ির কৌটো থেকে বিড়ি বার করে দাঁতের ফাঁকে গুঁজল। তারপর সস্তা দামের লাইটার ঘসে বিড়ি ধরাল। নকুল বিড়ি টানতে লাগল। মুখ তেতো হয়। থুতু ওঠে বারে বারে।

সেই সাত-সকালে এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল নকুল। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ খুঁজেছে। মুনিষ খাটার কাজ। কিন্তু কাজ পায়নি কোথাও। খরার জন্যে জমির কাজ বন্ধ। পাম্প-মেসিন অচল। ছিটেফোঁটা জল নেই কোথাও। জমি শুকিয়ে ঝুনো। এক দানা বীজ বোনার উপায় নেই।

চাষীদের ঘরে ঘরে হা-হুতোশ। সবাই আকাশ-মুখী। মাথায় হাত। গাঁয়ের চাষী। জন-মজুর। সবাই ছুটছে শহরে। গঞ্জে। নকুলও ভাবছে সেও যাবে শহরে। শহরে ভিক্ষা করেও পেট চালাতে পারবে। কিন্তু এই গাঁয়ে পড়ে থাকলে পাঁচটা প্রাণীর না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। তার ওপর কোলের বাচ্চাটার ব্যামো। অপুষ্টি রোগে ভুগছে বাচ্চাটা। ভিটামিনের অভাব। রক্ত শূন্যতায় হাত-পা ফুলো। বুকে ঠাণ্ডা জমে সর্দ্দির ডিপো।

গ্রামের হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবু বাচ্চাটাকে দেখেলেন। তিনি কলম বাগিয়ে খস্‌খস্‌ করে চিকিচ্চার ব্যবস্থাপত্র লিখলেন। ডাক্তারবাবু নকুলের মুখের দিকে তাকালেন একবার। বোধহয় ছেলের বাপের ক্ষমতা জরীপ করে নিলেন। অভাবী চাষী নকুল ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে ছিল যেন, সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করছিল। ওর ছেলে বুঝি এক্ষুণি ভাল হয়ে গেল।

ফর্দের মত প্রেসক্রিপশনটা নকুলের হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন: ওহে! শোন। এই ওষুধগুলো বাজার থেকে কিনে খাওয়াতে হবে। আমাদের এখানে এসব ওসুধ নেই। যাও। ছেলেকে নিয়ে বাড়ি গিয়ে একটু ভাল মন্দ খেতে দাও।

নকুলের চার/পাঁচ বছরের ছেলেটাকে দেখলে মনে হয় বছর খানেকের শিশু। আমের আঁটির মত চোপসানো মুখ। পেট টিন টিন। হাত-পা লিকলিকে হাডডিসার। নকুলের কোলে ঝিমোচ্ছিল।

ডাক্তারবাবুর দেওয়া প্রেস্‌ক্রিপশনটা নকুল বার কয়েক চোখের সামনে নাড়াচাড়া করল। তারপর চার ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে রেখে দিল। ছেলেটার ঝিমধরা চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল নকুল। একটা বুক ফাটা লম্বা নিঃশ্বাস পড়ল।

ছেলেটাকে কোলে করে পা টিপে টিপে এগোতে থাকে নকুল। হেলথ সেন্টারের বারান্দার গেটের মুখে এসেই নকুল দাঁড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালে লাগান পোষ্টার—তাতে দু'তিনটি ছয়/সাত বছরের স্বাস্থ্যবান শিশুর ছবি। আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করছে।

বাঃ! কী সোন্দর দেহ ছেলেমেয়েগুলোর। নকুলের মুখ থেকে অব্যয় সূচক শব্দটি বেরিয়ে আসে।

নকুল বাংলা অক্ষর একটু আধটু চেনে। তাই সে পোস্টারের লেখাগুলো অনেক কষ্টে পড়ে ফেলে—"আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ"। এ নামের যে কী অর্থ তা বোঝবার ক্ষমতা নকুলের নেই। তাই বোধহয় নকুলের মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগেনি। তবে ছবিতে শিশু

ছেলেমেয়েদের হাসি খুশি ভরা মুখ দেখে নকুলের দারুণ ভাল লাগল। নকুলের আফশোস হয়—তার ছেলেমেয়েগুলোর দেহ যদি এমনি হত। নকুল পোস্টারের ছবিগুলো দেখতে দেখতে সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে পড়ল। এবং একটি একটি করে সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ছেলে কোলে করে নীচে নেমে এল।

পাকুড় গাছের ছায়ায় বসে নকুল কত কী যে ভাবছিল। এতক্ষণে সে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ করা সেই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা বার করল।

প্রায় দু'হপ্তা হয়ে গেল। ছেলেটার মুখে একফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নকুল কত চেষ্টা করেছে। কিন্তু টাকার অভাবে অষুধ কিনতে পারেনি।

অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কাজ জুটলো না। আধপোড়া বিড়িটা জোরে জোরে টানতে লাগল নকুল। দুস শালা। নিভে গেছে। নকুল বিরক্ত হয়ে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। পিচ পিচ করে দাঁতের ফাঁকে থুতু কাটল নকুল। কপালে হাত তুলে সামনে তাকাল—জমির বুকে খরখরে রোদ্দুর। ধুসর। ঝাপসা। নাঃ শালার রোদ্দুরের তেজ পড়ে না কো। গামছা দিয়ে আবার ঘাড় গলার ঘাম মুছল। আর বসে থাকলে চলবে না। এবার উঠতে হয়। নকুল আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল। সে আবার ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে থাকে। আড়াআড়ি ভাবে জমি পার হয়েই পীচের সড়ক। হাই রোড। একটু গেলেই বাজার। দোকান-পাট। লোকজন। কেনা বেচা।

নকুল বাজারের পথে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

বেলা ঝিমিয়ে পড়েছে। সূয্যি নেমে গেছে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে। দূর গায়ের মানুষজন হাট-বাজার সেরে বাড়ি ফেরবে। পাঁচটি প্রাণী হা-মুখে নকুলের পথ চেয়ে বসে আছে। আজকের দিনটা বেকার বয়ে গেল। কোলের ছোট ছেলেটার জন্যে মন টাটায়। হপ্তা দুই হয়ে

গেল ডাক্তার যে ওষুধগুলো কিনে খাওয়াতে বলেছিলেন—পয়সার অভাবে সে সব কিছুই কিনতে পারেনি নকুল। ছেলেটাকে হয়ত বাঁচান যাবে না।

ছন্নছাড়া হাজার ভাবনা ভাবতে ভাবতে নকুল একটা প্যাণ্ডেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট খাটো জনসমাবেশ। ভেতরের বক্তৃতার অংশ মাইকের সাহায্যে বাইরে ভেসে আসছিল—বন্ধুগণ। আপনারা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের গ্রামের মানুষেরা অধিকাংশই চাষী। তারা কত গরীব। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন [illegible] করতে হয়। অভাব অনটনে তাদের সংসার অচল। তাদের ছেলে মেয়েরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। রোগে শোকে বিনা চিকিৎসায় অকালে মারা যায়। শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে এই সব শিশুদের ভবিষ্যত জীবন অন্ধকার। সুতরাং বন্ধুগণ, আজকের এই "আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ" উপলক্ষ্যে এই সব দরিদ্র শিশুদের জন্যে আমরা কী করছি? আমরা কী ভাবছি? বলুন। বন্ধুগণ, বলুন। আমরা কি কিছু করতে পারছি? না। কিছু করতে পারছিনা। কিচ্ছু করতে পারিনি। তাহলে বন্ধুগণ, এইসব সভা-সমিতি করে কি লাভ? আমার মতে এইসব সভা-সমিতি করে অনুষ্ঠান করে অযথা অর্থ অপচয় না করে, সেই অর্থ দেশের গরীব শিশুদের জন্য কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা উচিত। তাদের সংকটে সাহায্য করা উচিত।

কথাগুলো নকুলের মনে আশার সঞ্চার করল। ইখানে লিচ্চয় কিছু সাহায্যি পাওয়া যাবে। ইবারে রোগা ছেলেটার জন্যি ওষুধ কেনা হবে।

নকুল মনে মনে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ফতুয়ার পকেট থেকে ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা আবার বার করল। তারপর মানুষজনের মধ্য দিয়ে প্যাণ্ডেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল। এবং আস্তে আস্তে ডায়াসের সামনে সে এগিয়ে গেল।

নকুলের গতি-বিধি অনুষ্ঠান কর্মীদের নজরে পড়তেই তারা নকুলকে

বাধা দিল। কিন্তু নকুল কোন কথাই শুনতে চায় না। সে যাবেই সেই বক্তৃতা করা বাবুর কাছে। বাবু গরীবের মা-বাপ। বাবুর কাছে যেইতেই হবে। আপনাদের পায়ে পড়ি। আমাকে বাবুর কাছে যেইতে দ্যান। আমার রোগা ছেলেটাকে আপনারা বাঁচান। পয়সার অভাবে ওষুধ কিনতে পারিনাই বাবু। এই দ্যাখেন—ডাক্তারবাবু লিখে দ্যাছেন।

নকুল সেই প্রেসক্রিপশনটা ওদের দেখাল। কর্মীরা বিরক্ত হয়ে বলল ঃ এখানে এসব দেখিয়ে কী হবে। এখন বাবু ব্যস্ত আছেন। তুমি বরং অন্য সময় বাবুর সঙ্গে দেখা করো। এখন যাও।

ওরা নকুলকে ভাগিয়ে দিতে চাইল। আচ্ছা লোক রে বাবা। কোন কথা শুনতে চায় না। কে যেন চাপা গলায় বলল।

ঃ এবারে সামলাও। আমি লালুদাকে আগেই বলেছিলাম, ইলেকশানে দাঁড়াতে চাও দাঁড়াও। কিন্তু এই "শিশুবর্ষ" নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করো না। একজনের কথা থামতেই আর একজন বলল। ঃ আমিও তো বলেছিলাম। এরকম গরম গরম বুলি ছেড়োনা লালুদা। শেষে পস্তাতে হবে। কে একজন ওদের কথার মাঝখানে ধমক দিয়ে বলল ঃ মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিসনা তোরা। লোকটা সাহায্য চাইছে। ভালই তো। এতে আমাদের পাবলিসিটি হচ্ছে। লালুদা এবার ভোটে জিতবেই। দ্যাখ আমি লোকটাকে ম্যানেজ করছি। বলেই সে নকুলকে কাছে ডাকল।

নকুল গুটি গুটি এগিয়ে এল। তারপর কর্মীটি হাত নেড়ে নেড়ে নকুলকে কী সব বুঝিয়ে ভাঁজিয়ে ভাগিয়ে দিল।

নকুল সহজ সরল চাষী মানুষ। ওদের কথাবার্ত্তার এক বিন্দুও সে বুঝতে পারল না। তবে একটি কথা নকুল সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে, এ্যাখন বাবুদের হাতে ট্যাকা নাই। তবে। ভোটে জিতে মন্ত্রী হলে ত্যাখন সাইয্যি টাইয্যি মিলতে পারে।

দুঃখী মুখটা আরো কাচুমাচু করে নকুল নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

কেমন ম্যানেজ করে লোকটাকে ভাগিয়ে দিলাম। দেখতে গো-বেচারা হলেও আসলে কিন্তু ব্যাটা হাড়ে হাড়ে সেয়ানা। আর একটু হলেই সভাটাকে পণ্ড করেছিল আর কি।

একজনের কথা থামতে আর একজন বলল : সাধে কী বলে গেঁও চাষা।

: ঠিক। ঠিক বলেছিস। যাক। ব্যাটাকে তাড়িয়েছি।

নকুল এতক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল নকুল। মাঠের শেষ বরাবর সূয্যি ডুব মেরেছে। ন্যাড়া শিমূল গাছটার মাথায় সিঁদুরে রোদ্দুরের ঠেক লেগেছে। ট্যাঁসকোনা পাখিটা ট্যাঁ। ট্যাঁ। করে ডাকতে লেগেছে।

নকুলের মনটাও টাটিয়ে উঠল। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারি ঠেকতে লাগল। নকুল নিজের বাড়ির দিকে কোন মতেই এগোতে পারল না। মুহূর্তে তার অস্তিত্বটুকু দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।

অদূরে নকুলের বাড়ি থেকে ভেসে আসা আঁছাড়ি পাছাড়ি আর্তনাদের সুর কানে বাজতে লাগল। নকুল কেমন যেন ঝিম মেরে গেল। সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারল না।

"আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ" স্মরণে গল্পটি রচিত।

অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠের ধার ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ট্রাম বাসের ভিড় এড়াবার জন্য।

কিছুটা যেতেই ময়দানে শহীদ মিনারের পাশেই এক গাদা লোকের ভিড়। এ রকম ভিড়, জমায়েত এবং জনসমাবেশ ময়দানের প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে। নিত্য নিয়মিত ব্যাপার। আমরা দেখে দেখে অভ্যস্ত। তেমন কৌতূহল জাগায় না। তবু সময় কাটাবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলাম।

খেলা দেখানো হচ্ছে। তাসের গেলা। লোকটা হাতে একগোছা তাস নিয়ে খেলছে। সবাই দেখছে।

লোকটার একটা পা নেই। বাঁ পা কাটা। সেই কাটা পায়ে ক্র্যাচে ভর করে দাঁড়িয়ে লোকটা খেলা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাতের ডুগডুগিটা বাজিয়ে যাদু ছড়াচ্ছে।

জায়গাটা পছন্দসই বেছে নিয়েছে লোকটা। ময়দানে শহীদ মিনারের পাদমূলে। ভিড় জমবে ভাল। ঘাসের বুকে একটা ছেঁড়া গামছা পাতা রয়েছে। তাতে দু'চার পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

ঃ আসেন বাবু। আসেন। খেলা দেখেন। হাত কা সাফাই। তাসকা যাদু। বাচ্চালোক তালি বাজাও। জোরসে তালি। সঙ্গে সঙ্গে তালি বেজে উঠল।

ঃ এবার আউর একটা খেলা দেখাব। নয়া খেলা।

ডুগডুগির শব্দ টর-র-র টেক্কা-টেক্কা টর-র-র টেক্কা-টেক্কা। থামতেই লোকটা এক পায়ে ভর দিয়ে খেলা দেখাতে লাগল।

এতক্ষণে বাচ্চা বুড়ো সবাই চতুর্দিকে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে তেমন ভিড় নয়। মন লাগছে না খেলা দেখাতে।

আসল খেলা এখনো দেখানো হয়নি। লোকটার সামনে এক বালতি জল। একটি ঝাঁপি। ঝাঁপির ডালা খোলা তার মধ্যে একটা সাপ। জ্যান্ত সাপ।

বিকেলের ফিকে রোদ ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলি পাকানো সাপটার গায়ের খয়েরি কালো, হলুদ মেশান রঙে ঝিলিক ছড়াচ্ছিল।

আবার ডুগডুগির শব্দ বেজে উঠল। রাস্তায় অফিস ফেরত জনতার ভিড়। এবার ভিড় বাড়বে খেলা জমবে।

ঃ আসেন বাবুলোক। আসেন। খেলা দেখেন। নতুন খেলা। এবার যে খেলা দেখাব বাবু বহুত কিস্মতি খেলা। জান কবুল খেলা। হ্যাঁ, বাবু। জান কবুল খেলা।

লোকটার মুখের বোলের সঙ্গে সঙ্গে হাতের ডুগডুগিটা বারে বারে বাজতে লাগল।

পশ্চিমে সূর্য গঙ্গায় নেমে গেছে। নীল আকাশের শেষ প্রান্তে ডিমের কুসুম ফাটান রঙ লেগেছে।

তাসগুলো গুছিয়ে রাখল লোকটা। আসলে তাসের খেলা লোক জোগাড়ের জন্যে। লোকটা একবার দেখে নিল চারদিক। দর্শক জমেছে ভাল। এবারে সাপের খেলাটা দেখান যায়।

ঝাঁপির সামনে এগিয়ে গেল লোকটা। হাতের ডুগডুগিটা বাজাতে লাগল বারে বারে। ক্র্যাচটা রেখে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোট্ট সাপটা নিয়ে খেলা দেখাতে লাগল। একসময় খপ করে সাপটাকে ধরে ফেলল লোকটা। ঝাঁপি থেকে তুলে নিল। নিজের বাঁ হাতে সাপটাকে জড়িয়ে রাখল লোকটা। ক্র্যাচে ভর করে আবার উঠে দাঁড়াল সে। সবাইকে দেখে নিল। ঘুরে ঘুরে সবাইর সামনে গিয়ে বলল ঃ বাবুরা। দেখেন। খেলা দেখেন। হাত সাফাই নেহি। যাদু ভি নেহি। ইয়ে সাচ্চা খেলা। জান কবুল খেলা। দেখুন বাবু—এই সাপটা আমি খেয়ে

লিব। কৈ যাদু নেহি। চালাকি ভি নেহি। ইয়ে সাচ্চা খেলা। লিকিন সাপটা আবার বের করে দেব। জ্যান্ত উগ্রে বের করে দেব বাবু। দেখেন বাবু। কেইসান তাজ্জব খেলা দেখেন। ডুগডুগি বাজাতে লাগল।

আমার সামনে যখন লোকটা এল তখন ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ক্র্যাচে ভর করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতের কব্জিতে সাপটা প্যাচান। তাকালাম লোকটার দিকে। দীর্ঘ ঋজু দেহ। উন্নত টিকাল নাক। কোটরাগত চোখেও ধারাল দৃষ্টি। মাথায় ঝাকড়া চুল। গালে অযত্নে রক্ষিত কাঁচা পাকা দাড়ি। দেখলেই মনে হয়—বয়েসকালে ছিল একটি তেজী ঘোড়া। এখন দানাপানির অভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে।

লোকটার চোখ মুখের আদল আমার কাছে পরিচিত মনে হ'ল। মুহূর্তে স্মৃতির পাতায় নাড়া পড়ল। প্রায় পনের বছর পেছিয়ে গেলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি।

আমাদের পাড়ায় থাকত লোকটা। নাম—মান্নান মিঞা। আমরা মান্নাদা বলেই ডাকতাম। আমাদের বাড়ির পাশে একটা মোটর গ্যারেজ ছিল। সেই গ্যারেজে মান্নাদা'র চাচাতো ভাই কাজ করত। গাড়ি ধোয়া, মোছা সাফাই করার কাজ। সেই চাচাতো ভাইর সঙ্গে থাকত মান্নাদা। এখানে এই কোলকাতায় এসে চাচাতো ভাইর ঘাড়ে চেপে বসে থাকতে হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার হালচাল বুঝে নিয়ে মান্নাদা পয়সা উপায়ের ধান্ধায় নেমে পড়ল। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতে লাগল।

তখন দেখছি—মান্নাদা জলের সঙ্গে জ্যান্ত সিঙ্গি মাছ গিলে ফেলত। আবার উগ্‌রে বের করে ফেলত। এ-খেলা দেখিয়ে নিজের পেট চলে যেত। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে রাস্তায় মান্নাদা'কে দেখতে পেতাম? কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে আর মান্নাদা'কে চোখে পড়লনা। কোথায় গেল কে জানে?

গ্যারেজের চাচাতো ভাইকেও আর দেখতে পেলাম না। সেও বোধ হয় চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। তার পর প্রায় পনের/ষোল বছর বাদে আবার মান্নাদা'র দেখা পেলাম। দারুণ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে তাকে চিনতেই পারিনি। যে মান্নাদা অক্ষত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল—সেই মান্নাদা'র আজ কী অবস্থা! তার একটা পা নেই। মান্নাদাও আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বোধ হয় সেও স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়াচ্ছিল। প্রথমে আমিই 'মান্নাদা' বলে ডেকে উঠলাম। সে আরো এগিয়ে এল। আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। তারপর আমার নাম ধরে ডাকল : মাখনবাবু—তুমি!

ঃ হ্যাঁ—আমি। মান্নাদা আমাকে তোমার মনে আছে?

: হ্যাঁ—হ্যাঁ—জরুর মনে আছে। মান্নাদা'র কপালের বলিরেখায় ভাঁজ পড়ল? চোখের পাতা পিট্ পিট্ করে উঠল। মুখে কাঁচাপাকা দাঁড়ির আড়ালে খুশি খুশি ভাব ফুটল।

কিন্তু আমার মনে একটা ব্যথার সুর বাজতে লাগল। মান্নাদা'র বাঁ পা-টা কি করে কাটা গেল সে কথা জানবার জন্যে আমার মন আকুলি বিকুলি করতে লাগল। আমার চোখ মুখে একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন জেগে রইল। এত লোকের ভিড়ের মাঝে মান্নাদা'কে আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। তা ছাড়া এখন সে খেলা দেখাতে ব্যস্ত। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক চক্কর ঘুরে এসে মান্নাদা ক্র্যাচে ভর করে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি লক্ষ্য করলাম মান্নাদা'র গায়ের তালি-তাপ্পি মারা জামাটা ঘামে ভিজে ছপ্‌ছপ্ করছে। বোতাম খোলা, জামার ফাঁকে বুকের পাঁজর বেরিয়ে আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন হাঁপাচ্ছে। কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে। ঘাড়ে গলায় ছুলির দাগ ছোপ ছোপ ছড়িয়ে আছে। হাতের কব্জিতে তখনো সাপটা জড়ানো রয়েছে।

সামনে রাখা বালতি থেকে পাঁচ/সাত গেলাস জল খেয়ে নিল

মান্নাদা। ঢেঁকুর তোলার কায়দায় কিছুটা জল বার করে দিল। আবার দু'/চার গেলাস জল খেয়ে নিল। তারপর হাতে জড়ানো সাপটার ল্যাজ ধরে টেনে প্যাঁচ খুলে নিল। সকলের সামনে সাপটাকে ঘুরিয়ে দেখাল। ডুগ্‌ডুগি বেজে উঠল। মান্নাদা'র মুখেও বোল ফুটল : বাবুরা, দেখেন। জান কবুল খেলা দেখেন। বাচ্চালোক আউর একবার তালি বাজাও। জোর-সে তালি। তালি বেজে উঠল। মান্নাদা খুশি হল। সে সাপটার ল্যাজ ধরে কয়েক পাক ঘুরিয়ে নিল। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। কপালে হাত ঠেকিয়ে কী সব বিড় বিড় করে বলল।

দর্শকদের উৎসাহ বেড়ে গেল। এতক্ষণে ভিড় জমেছে ভাল। গামছায় পয়সা পড়ছে টুপটাপ। পাঁচ, দশ, সিকি, আধুলি পর্যন্ত।

: বাবুরা দেখেন। আমি সাপটা খেয়ে ফেলব। একদম গোটা সাপটা খেয়ে লিব বাবু। বলেই সাপটাকে দলা পাকিয়ে হা-করে নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিল মান্নাদা। আবার গেলাস গেলাস জল খেল। কিছুক্ষণ মাত্র। মিনিট খানেক পরে মান্নাদা বলল : এবারে সাপটা বার করব—দেখেন বাবুরা তাজ্জব খেলা দেখেন। ডুগডুগি আবার বেজে উঠল।

: বাচ্চারা, তালি বাজাও—জোরসে তালি। তালি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকুর তুলে খানিকটা জল বের করে দিল। সাপটাও বেরিয়ে এল। জ্যান্ত সাপটার ল্যাজটা ধরে আবার উপস্থিত দর্শকদের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল। সবাই অবাক। অসাধ্য সাধন। জান কবুল খেলা বটে।

ঘাসে বিছানো গামছায় আরো পয়সা পড়তে লাগল।

মান্নাদা'র সাপ-খাওয়া খেলা দেখে আমিও অবাক হলাম।

ভিড় ভেঙ্গে গেল। দর্শকরা চলে গেল।

পশ্চিমের আকাশে বিকেলের শেষ রোদটুকু ফিকে হয়ে গেছে।

পাশেই পাতাল-রেলের মাটি-কাটা যন্ত্র। প্রলম্বিত ক্রেন।

কুলিকামীনদের কর্মযজ্ঞ। সামনেই বড় সড়ক। অসংখ্য যান-বাহন। মানুষ-জনের ভিড়। মহানগরীর কর্মচঞ্চলতা। পাশেই জীবন-বীমার বিরাট প্রাসাদ। মেট্রো, গ্র্যাণ্ড প্রভৃতি অভিজাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

মান্নাদা চলে যাচ্ছে। ময়দানের সবুজ ঘাসের বুকে ক্র্যাচে ভর করে সে চলে যাচ্ছে। আমিও পেছন পেছন এগোতে লাগলাম। ভাবলাম ডাকা ঠিক হবে কিনা। কারো ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের কথা জানতে চাওয়া সমীচীন হবে কি? আমার রুচিতে বাধছে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বুঝতে পারলাম—ডাকা উচিত। যার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, আজকে তার দুরবস্থা দেখে দূরে সরে যাওয়া কাপুরুষতা। যদিও সেই দুঃখ কষ্ট দূর করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আবার ডাকলাম—'মান্নাদা'। মান্নাদা কোন উত্তর করল না। বোধ হয় শুনতে পায়নি। আবার ডাকলাম এবারে মান্নাদা মুখ ফেরাল। ক্র্যাচে ভর করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম: তুমি চলে যাচ্ছ মান্নাদা?

: হ্যাঁ—মাখনবাবু। মান্নাদা'র ছোট্ট জবাব। এতদিন বাদে আমাকে দেখেও মান্নাদার তেমন উৎসাহ জাগল না। কেমন যেন নিস্পৃহ, নির্বিকার ভাব মান্নাদার চোখে মুখে। আমি যে কী ভাবে কথা শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। সব যেন কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে।

: তোমার পা কাটা গেল কি করে মান্নাদা? মান্নাদা ঘাড় সোজা করল।

: -ই বাত্ শুনবে বলে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ মাখনবাবু!

: হ্যাঁ মান্নাদা— তোমার সব কথা শুনতে ইচ্ছা করছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে বল।

: কি বলব মাখনবাবু। সি সব বাত বলতে গেলে এক কাহানী হয়ে যাবে। সি কাহিনী শুনে তুমার কি লাভ হবে?

: লাভ আছে মান্নাদা। সংসারে সব অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে।

আচ্ছা মান্নাদা—তুমি তো সাদি করেছিলে। তোমার বিবি কেমন আছে?

ঃ বিবি! মান্নাদা আমার দিকে তাকাল। আমি লক্ষ্য করলাম —মান্নাদার চোখ ছুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। আমার অস্বস্তি লাগছিল। কিছু না জেনে মানুষটাকে অযথা ব্যথা দিলাম বুঝি।

ঃ বিবি নেই! মাখনবাবু। মান্নাদা মুখ ঘুরিয়ে নিল। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। এর পর আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। আমাকে নীরব থাকতে দেখে মান্নাদা বলল: আমার বিবিজানের কাহানি শুনবে মাখনবাবু? তবে শুন—

ঃ না—থাক। আমি বুঝতে পারিনি মান্নাদা। না জেনে তোমায় ছুঃখ দিলাম।

ঃ ছুখ! তুমি কেন ছুখ্ দিবে মাখনবাবু? ছুখ্ যে দিয়ে গেল তার কাহিনী শুন। মান্নাদা আমার দিকে মুখ ঘোরাল।

ঃ আমার পা গেল ছুখ্ নাই—লেকিন আমার বিবি আমাকে সবসে জ্যাদা ছুঃখ দিল। তাকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ঃ শুন মাখনবাবু, সারকাসে নোকরি মিলল। সাদি করলাম সনসার ভি হল। লেকিন যো তলব পেতাম তাতে সনসার চলত না। বিবি বহুত বাহানা ধরত। ওর কষ্ট ভি হত। সারকাসের মালিককা পাশ গেলাম—তলব বাড়াতে বললাম—মালিক রাজী হলনা। বহুত তক্‌লিব হতে লাগল। বিবিজানের মুখ ভার থাকত। আমি সব বুঝতে পারতাম। বিবির মুখে হাসি ফোটাতে গেলে আউর রূপায়া চাহি। লেকিন রূপেয়া কাহাসে মিলি? ফিন মালিককো পাশ গেলাম। সব কুছ সমঝালাম! মালিক থোড়া কৃপা দেখাল। বলল: ঠিক আছে—তোমার তলব কুছ বাড়িয়ে দেব! তবে তোমাকে আরো বাড়তি কাম করতে হবে! আমি রাজী হয়ে গেলাম। বাড়তি কাম করতে গিয়ে আমি কুলীর কাম ভি করতে লাগলাম।

কোলকাত্তা সে বাহার সারকাসের তাঁবু পড়ল। ছোটা সহর। মালপত্তর বহুত কিসিমকা জিনিসপত্র—এক জায়গাসে দোসরা জায়গামে আনতে হবে। আমার ডাক পড়ল তাঁবু টাঙাতে। বহুত বড়া তাঁবু টাঙানো হবে! একটা বহুত উঁচা মাস্তুলের মাথায় আমাকে উঠতে হবে। মাস্তুলের মাথায় কপিকল লাগিয়ে মোটা মোটা দড়ি বাঁধতে হবে। খুব জলদি কাম করতে হবে। তুরন্ত কাম করতে হবে।

আমি তখন মাস্তুলের মাথায়। তিরিশ ফুট উচাতে কাম করছিলাম, হঠাৎ আমার শির ঘুমনে লাগল। আমি পড়ে গেলাম। বহুত চোট পেলাম। বাঁ পা ভেঙ্গে গেল।

এতক্ষন হিন্দি বাংলায় একনাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে পড়ল মান্নাদা। পকেট হাতিয়ে একটা ছোট্ট ডিবা বার করল। দু' আঙ্গুলের মাথায় নস্যি নেবার মত এক টিপ খইনি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল সে।

: হাসপাতালে ছ'মাহিনা পড়ে রইলাম। বাঁ পা-টা বরবাদ হয়ে গেল। পহিলে মাস হাসপাতালে এসে বিবিজান দেখভাল করেছিল। লেকিন কুছদিন বাদ বিবিজানের আসা বন্ধ হয়ে গেল। কোন পাত্তা ভি মিললনা। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। তখন আমি একদম অচল। কোই দেখভাল করবার মত ছিলনা। বাড়ির কোন খবর মিলতনা।

হাসপাতালসে বাড়ি ফিরে দেখলাম—বিবি নেহি। তাজ্জব বনে গেলাম। কি ব্যাপার! বিবি কোথা গেল! পাশের ঘরসে খবর মিলল—বিবিজান ঘর ছোড়কে সার্কাসকা মালিককো সাথ চলি গোয়ি। শালা মালিক—বিবিকো ভাগা লিয়া। মাখনবাবু। দুনিয়ামে কাকে বিশোয়াস করব? কাকে পিয়ার করব? বিবিকে সুখী করতে—নিজের জান কবুল করলাম। আমার পা-কাটা গেল। বিবিজান হামকো ছোড়কে ভাগ গেল—মাখনবাবু।

আমি মান্নাদা'র কাছে এগিয়ে গেলাম। তার পিঠে সহানুভূতি মাখা হাত রেখে বললাম : মান্নাদা, চল, আমার সঙ্গে চল—আমাদের বাড়ি থাকবে চল।

: নেহি। মাখনবাবু। তোমার বহুত মেহেরবানী আমাকে ছেড়ে দাও। মুঝে একলা যানে দো।

মান্নাদা ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে আবার ক্র্যাচে ভর করে হাঁটতে শুরু করল।

ময়দানে সন্ধ্যা নেমেছে। ঘন সন্ধ্যা ছায়া। মান্নাদা, তখনো হেঁটে যাচ্ছে। পশ্চিমে রাজভবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার দিকে হেঁটে চলেছে।

আমি তাকিয়ে রইলাম। মান্নাদা'র ছায়া সন্ধ্যার আলো আঁধারের মাঝে মিশে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে গেল।

"আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ" স্মরণে গল্পটি রচিত।

সবুজ স্বপ্ন

শীতের আবছা সকাল। ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ঝাপসা চতুর্দিক। জমির ওপারে পুব বরাবর সূর্যি। আধখানা সরার মত জেগে উঠেছে। ভোর সকালের লালচে আভা। কুয়াশা ভেজা ধান-জমি। খেত খামারে লেপটে গেছে।

আল পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জমির সামনে এসে দাঁড়াল হারু। শিশির-ভেজা ঘাসে পায়ের পাতা ভেজা। ধান বীজের সাদাটে গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে সিঁটিয়ে আছে।

এতক্ষণে কুয়াশা কাটে নি। মাঠের মাঝ বরাবর সূর্যি আরো উপরে উঠেছে। সোনা-রোদ্দুর সবুজের শিরে শিরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধানের পাতায় ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু চক্ চক্ করছে।

শিমূল গাছটার গোড়ায় হারুর সঙ্গে গাঁয়ের মানুষ অনেকের দেখা হয়ে গেল। ভজন, পাঁচু, সেলিম, সামাদ। এরা সবাই এসে হাজির। ওরা সবাই জমিতে নামবে। ধান কাটবে। সবার হাতে কাস্তে। হারুকে ডেকে ভজন শুধায় : কিগো, হারু এলে নাকি? তুমার জমিতে ইবার ফসল ভালই হইছেক।

: হু। খাটতে পারলে ভাল ফসল হবেক বটে। হারুর ভারী গলার স্বর শুনে ওরা সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে : হ্যাঁ, হ্যাঁ লেহ্য কতা। লেহ্য কতা।

: ইবারে জমিতে সত্যি ফসল ভাল ফলেছে। সারা মাঠে সোনা রঙ ধান ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাকা ফসলের ঘ্রাণে মন মেতে উঠছে। পাখ পাখালিরা ভোরের আলোয় উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

সবার মনে সোহাগ উপচে পড়ছে। ওরা সবাই মাঠে নেমে পড়ল।

কাস্তে হাতে ব্যস্ত গতিতে ধান কাটতে লাগল। খস্ খস্ শব্দ। ফসল কাটার শব্দ উঠছে। গোছা গোছা ধানের আটি জমিতে শুইয়ে রাখা হচ্ছে।

এতক্ষণে আলোর রোশনাই শিমুল গাছটার মাথায় ঠেক খেয়েছে।

খুশির নেশায় মেজাজের সঙ্গে বিড়ি টানছিল হারু। এবারে সে দারুণ খাটুনি খেটেছে। জমির ফসলের দিকে তাকালে চোখ জুড়ান দেয়। কিন্তু হারুর মনে তত সুখ নাই।

এ জমির মালিক হারু নিজে নয়। সে পরের জমির ভাগ-চাষী। জমির লেগে যতই খাটুক না ক্যানে জমির মালিক বিনে খাটনিতে আধা ভাগ পাবে ফোকটাই। এ ফসলের সবুজে সবুজে মিশে আছে হারুর জান কবুল খাটনি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে হারুর বুক চিরে।

সারা রাত জাগানি দিয়ে এ মাঠের ফসল পাহারা দিতে হয়েছে। নইলে রাতের অন্ধারে চোর ধান কেটে নে যাচ্ছে। থানা-পুলিশ করে কুনো লাভ নাই। বিড়ির গোড়ায় শেষ টান দিয়ে কোমরের কাপড় কষে নিল হারু। তারপর মাঠে নেমে পড়ল। শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। হাড়-কাঁপুনি শীত। শিরশিরে উত্তুরে বাতাস। বেলা বাড়ছে। রোদ্দুরটা মালুম হচ্ছে। মিষ্টি। মোলায়েম। গা গরম হচ্ছে। কাজে মেজাজ আসছে। ধানের গোছা ধরে কাস্তে চালাতে লাগল হারু। আঁটি আঁটি ধান কাটা হচ্ছে।

জমিতে কাজ করতে করতে মায়ের কথা মনে পড়ে—শরীলটার উপুর লজর রাখিস্ বাপ। ইকলা চার-পাঁচখানা মাঠ সামলানো সহজ কথা লয়। কারুকে সঙ্গে লিস্ বাপ। মায়ের মন। এখুনো মা হারুকে ছেলে মানুষটি ভাবে। বয়েস কেলে জোয়ান মরদ সে। এখুন না খাটলে আর খাটবে কবে। এই দুর্দিনে কাজ পাওয়া যায় না। কাজের অভাবে মুনিষরা বেকার বসে আছে ঘরে। এই চার-পাঁচ খান জমি অনেক কষ্টে হাতে রেখেছে হারু। তাও বাবুরা অন্য মুনিষ

লাগাতে চায়। ইবারেই তো পাঁচুটা বেইমানি করে হারুর নামে চুকলি কেটে বাবুদের বিগড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তুক পারে নাই। হারুকে বাবুরা বিশ্বাস করে। গাঁয়ে ভাল মানুষ বলে সুনাম আছে হারুর। খাটুয়ে বিশ্বাসী মুনিষ সে। দিনে রেতে জমিতে জান কবুল খাটে।

একদিন হারু জমি করবে। ঘর বাঁধবে। এ সাধটুকু ঢেক দিন থেকেই হারুর বুকে জমে আছে ঠাণ্ডা বরফের মত।

সুমুখে গাঁয়ের দিকে লজর সরাতেই হারুর চোখ পড়ে, সামনে পড়ে আছে সোনা-রঙ ধান জমি। কুথাও লুটানো। কুথাও শীষের মুখ নিচু করে খাড়া ধানের গুচ্ছ। খেজুর গাছ, তাল গাছ মাথা উচিয়ে আছে। উদিকে ঝোপঝাড়ের পাশে 'শোনে' ছাওয়া কুড়ে ঘর। পাশেই বট। দূরে যতটা লজর যায় হারুর চোখে মুখে খুশি ছড়ায়।

দ্রুত কাস্তে চালাতে থাকে হারু। সন্ধ্যে নামার আগেই কাজ শেষ করতে পারবে সে। জিরান দিলে চলবে না। একটু কষ্ট করতে হবে বেশি পরিমাণে। গা ঘেমে উঠেছে। হারু কোমর সোজা করে দাঁড়াল। এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে ধান কাটতে লেগেছিল। গায়ের চাদর খসাল সে। কাস্তেখানা রাখল। আকাশমুখি তাকাল। সূর্যি মাথায় উঠছে। খিদে লেগেছে জব্বর। এক্ষুনি খেয়ে লিতে হবেক। পেটে খিদে নিয়ে কাজ এগোয় না মোটে। পুঁটলি বাঁধা খাবার সঙ্গে ছিল। খাবার বার করল হারু।

মাকে খাবার লিয়ে মাঠে আসতে মানা করছে সে। এতটাক দূর পথ ভেঙ্গে বুড়ো মানুষ মাঠে আসবে, ইটা হারু চায় না। সংসারে মা ইকা মানুষ। ইকলা হাতে সব কাজ করতে হয়। তার উপর বুড়ি মাকে দিয়ে মাঠে খাবার বইয়ে আনা। না। কিন্তু মাকে মানা করেও শুনোতে পারে নি হারু। তাই আজ গামছায় পুঁটলি বেঁধে খাবার সঙ্গে করে লিয়ে এসেছে সে। পুঁটলি থেকে খাবার বার করল। জমিতে বসেই খেয়ে নিল। তারপর ট্যাকে গোঁজা বিড়ির কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরাল। মেজাজের সঙ্গে টানতে লাগল।

হাটে যাবার পথে খালেদ মিঞা বড় সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঃ কিগো, হারু। ধান ক্যামুন পেলে ?

ঃ তা, ইবারে মন্দ লয়।

ঃ সঙ্গে ইকটা মুনিষ লাগালে ই বেলাতেই সব ধান কাটা হত। খালেদ মিঞা মাথার আনাজ তরকারির ঝুড়ি নামিয়ে বলল।

ঃ ক্যানে, লুক লাগবে ক্যানে। আমি ইকা কম কিসে ? জোয়ান মরদ বয়েস কালে খাটতে ভয় কি। হারু পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। খালেদের এমন কথা শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। তারপর কাস্তে হাতে নিয়ে ঘাড় গুঁজে আবার হারু ধানের গোছা কাটতে লাগল।

ঃ তাতো বটেই। ই তল্লাটে তুমার মত খাটিয়ে মুনিষ ক'জনা আছেক। খালেদ মিঞা সায় দিল। হারুকে ব্যস্তভাবে কাজ করতে দেখে সে আবার বলল ঃ আচ্ছা, তাহলে ইবারে চলি। অনেকটাক পথ যেতে হবেক। খালেদ মিঞা সবজির ঝুড়ি মাথায় তুলে বড় সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল।

মাথার সূর্যি খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। দূরে মাঠে ধানখোটা পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে।

সাঁঝ নামার আগেই সব ধান কাটতে হবে। বাড়ির উঠোনে নিয়ে জমা করতে হবে সব ধান। কাটা ধান জমিতে ফেলে রাখা যাবে না। চোরে সব সাবাড় করে নে যাবে। ই বছর চোরের ঝামেলা খুব বেড়েছে। জমির মালিক পরিমাণ মত ধান না পেলে হারুকেই দুষবে। শুধু দুষ দিয়েই ক্ষান্তি নাই। ভাগ দেবে না ঠিক সমান মত।

সূর্যি নেমেছে মাঠের শেষ সীমানায়। বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে শেষ বেলার ফিকে রোদ্দুর। পাখ পাখালিরা কুলায় ফিরছে। ধানের আঁটি বোঝাই গরুর গাড়ির গাঁয়ের মেঠো পথে গুটি গুটি এগুচ্ছে।

সাঁঝ নেমেছে কুঁড়ে ঘরের চালে। লাউ মাচা আর কলা গাছের দীঘল পাতায়। সর্ষে, মটর, কলাই-এর ডগায়।

হারুর মা ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবছে—ছেলেটা মাঠ থিকে এখুনো ফিরেক নাই। মাঠে মাঠে দিনে রেতে খেটে ছেলেটার লিচ্চয় ব্যামো ধরবেক।

রাতে হারুর মা হারুকে আদর করে খাওয়াচ্ছে। আর চাট্টি ভাত নে বাপ্। এমুন খাটুনি খাটলে শরীলটার পানে লজর রাখতে হয়।

হারু মুখে রা করে না। সে বড় বড় গরাসে ভাত সাবাড় করে উঠে পড়ে। মায়ের মুখে এমুনধারা কথা শুনে শুনে সে খামতি মেরে গেছে।

সোনার ফসলে বাড়ির সারা উঠোন ভরে গেছে। আমন ধানের আঁটি একের পর এক গোছা গোছা সাজান রয়েছে। দেখে চোখ জুড়িন যায়। খুশিতে বুক ভরাট হয়। হারু ইকাই একশো— ইকথা সত্যি। ছেলেটার ক্ষ্যামতা আছে। হারুর মার বুকখানা খুশির আমেজে ফুলে ফেঁপে ভরাট হয়ে ওঠে। ইবারে ছেলেটার বে দিতে হবেক। আর দেরি লয়। পাশের গাঁয়ের পরান পাড়ুই খবর পাঠিনছে। হারু যদি রাজী থাকে তো তার মেয়ে তুলির সাথে সামনের মাঘে বে হতে পারে। হারুকে তাদের ভারি পছন্দ। কিন্তুক ছেলে যে বিবাগী। সে কিছুতেই রাজী লয়। হারু বে করবেক লাই। তবে আজকে হারুর মনটা খুশি খুশি লাগছে। বাড়ির ওঠোনে জোছনা ছড়িয়ে আছে। পাকা ধানের আঁটিগুলো উঠোন ময় সাজানো। হারু দাওয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকছে। মা ছেলের কাছে এসে আবার বসল। সোহাগের সুরে হারুকে ডাকল: হ্যাঁ-রে বাপ্ ইবারে বে' থা একটা কর। মুই আর ই সনসার আলগাতে পারিছি না বাপ্। পাশের গাঁয়ের পরান পাড়ুই লুক পাঠিনছিল। তার মেয়ে তুলিকে তুর সাথে মানাবেক ভাল। ভারি সোন্দর মেয়েটা। যেমুন দেখতে তেমুন কাজে কম্মে সমান। মায়ের মুখে আবার সেই ঘ্যান ঘ্যানানি। হারুর ভাল লাগে না। সে দাওয়া থেকে উঠে ঘরে চলে আসে। গায়ে ক্যাথা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। সেই সকাল

থিকে সারাদিন ক্ষেত-খামারে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। শরীলটা যেন নেতিয়ে পড়েছে। আর বইতে চায় না। অবশ দেহটা নিয়ে পড়ে থাকে হারু। কিন্তুক চোখে ঘুম আসে না। মা যেন উঠে পড়ে লাগছেক। তুলিকে ঘরের বউ করে আনবেই। কিন্তু মা-কি জানে—হারুর মনের কথা? সে যে মন দিয়েছিল কুসুমকে—হঠাৎই হারুর মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। কুসুমের কথা এতদিন সে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছিল। সারাদিন সারাক্ষণ কাজের মধ্যে হারু নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল। তবু কুসুমের কথা মনে পড়লে তার মনটা টাটিয়ে ওঠে। কিছুতেই নিজের পরাণডারে সামাল দিতে পারে না।

মা আবার শুধোলো: কি হলো বাপ্। চুপ মেরে গেলি ক্যানে?

হারু বিরক্ত হয়। সে মায়ের কথার জবাব না দিয়ে ওপাশ ফিরে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগে—বিড়ির ধোঁয়ার মত ঝাপসা ঠ্যাকে সব। হারু যেন হারিয়ে যায়—বছর দু'য়েক আগের সেই হলুদমাখা দিনগুলোর মাঝে—কিশোরী মেয়ে কুসুম। বাপের সঙ্গে মাঠে আসত কাজ করত। পাশের জমিতে হারু কাজ করত। কাজের ফাঁকে চোখাচোখি হত দু'জনে। মুখ টিপে হাসাহাসি।—সেই মেয়ে কুসুম। দেখতে দেখতে তর তর করে শ্রাবণের শস্যের মত বেড়ে উঠতে লাগল। সে-বাড়ে যেন, বাড়ে সবুজ ঢলঢলে পাতা যেমন দীঘল হয়। তেমনি কুসুমেরর শরীর ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। তাকাতেই কেমন সম্ভ্রম জাগত। ডোরাকাটা লাল শাড়ি পরা কুসুম আলাদা এক শরীর পেয়েছিল। যেন নতুন বউ। রঙীন পাখির মত রঙের রোশনাই। চোখের চাউনিতে রঙের বাহার।

'শোনে' ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। ঘরের মাটির দেওয়ালে পিঁটুলি গোলার আলপনা। সামনে গোবর নিকোনো আঙিনা। তুলসি-মাচা, ঘরের কোণে লক্ষ্মী-ঝাঁপি। মেটে সরায় চিত্তির আঁকা। পিদিমের মিটমিটে আলোয় মা লক্ষ্মীর মুখ। কড়ি বাঁধানো বটুয়া। কুলোয় মাঙ্গলিক আঁকড়ি। সাঁঝের বেলায় শাঁখ বাজে। কুসুম মাথার ঘোমটা

টেনে ভূঁয়ে মাথা রেখে পেন্নাম ঠোকে। হারুর ভারি ভাল লাগত। খুশিতে মন মেতে উঠত।

সকাল-সন্ধে মায়ের কাছে আসত কুসুম। ওদের অসচ্ছল সংসার। বাপ বেতো রুগী। অক্ষম। শক্তি সামর্থ্য সবই ছিল মানুষটার। এই ত সেদিন ঝড় জল ভেঙ্গে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরবার পথে একটা গাছের গুড়ি ভেঙ্গে পড়ল। ঠিক কোমর সোজা চোট পেল মানুষটা। বেজায় ব্যথা পেল কোমরে। সেই ব্যথা টাটানি আর গেল না। মানুষটাকে মেরে ফেলল। বাতের ব্যথায় ভুগে ভুগে মানুষটা একেবারে শেষ হয়ে গেল! কুসুম তখন ডাগর ডোগর ভরা যুবতী। ঘরে রাখা দায়। কে সামাল দেবে এই সোমত্ত মেয়েকে।

পাশের বাড়ি হারুদের। হারুর মায়ের মায়ার শরীব। মেয়েটাকে ভালবাসে বুড়ি। কুসুম সর্বদাই আসা-যাওয়া করত হারুর মায়ের কাছে। বুড়িমার হাতের কাজ-কম্ম টেনেটুনে নিয়ে করে দিত। তবে হারুকে দেখলেই সে যেন গুটিয়ে যেত। কথা কইত না হারুর সঙ্গে। মা একদিন বলেছিল: কুসুমকে বউ করলে ক্যামুন হয় রে বাপ্? মেয়েটা ভাল। খাটিয়ে মেয়ে। তোর সাথে মাঠে মাঠে কাজে লাগবেক। ওকে ঘরের বউ করে আনলে তুই সুখী হবি হারু।

সেই মা'র মুখেই আজ আবার তুলির কথা। এ সনসার যে কত নির্দয়। এর চরিত্তির বুঝা দায়। সেই জন্যেই মায়ের ওপর রাগ বাড়ে হারুর। কেবল সেই একই কথার প্যানপ্যানানি। তবে রাগ পড়লে বুঝতে পারে সে। মায়ের জন্যে মায়া হয়। তার কি দুষ। ঘরে জোয়ান ছেলে থাকলে কে না চায় ছেলের বউ ঘরে আনতে। তাই কুসুমকেই তো মা ঘরের বউ করতে চেয়েছিল! কিন্তুক—

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল কুসুম আর আসে না। মেয়েটার হল কি! এই সেদিনও সে হারুর সঙ্গে মাঠে কাজ করে গেল। ধান কাটল। আঁটি বাঁধল। আবার সেই বীজ মাথায় করে হারুর সঙ্গে বাড়ি বয়ে আনল। কিন্তু সেই দিনের পর আর এল না কুসুম।

তবে কি জগা হাবলুর দল কুসুমের পেছু লেগেছেক। অসম্ভব লয়। বেচারী মা-মরা মেয়ে। বুড়ো বাপ। বেতো রুগী মানুষটাকে নিয়ে কুসুম কুথায় যাবেক। জগার কবল থিকে কি করে রেহাই পাবেক।

জগা-হাবলুর কথা মনে পড়তেই হারুর মেজাজটা কেমন চিড়িক মারতে লাগল। শালা বদ্‌মাইস কুথাকার। হারুর মুখখানা বিরক্তিতে ভরে উঠল। সেদিন পথের মাঝে জগার সঙ্গে হারুর দেখা হয়ে গিয়েছিল: কি হে হারু সঙ্গে একটি রাধা লিয়ে মাঠে মাঠে কাজ করছিস্। ধান কাটছিস্। হেঃ হেঃ হেঃ। সব ক'টা দাঁত কেলিয়ে জগা হারুর সামনে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ পথের মাঝে এভাবে যে হারুর সঙ্গে জগার দেখা হয়ে যাবে তা সে কখুনো ভাবে নাই। এ যেন শিকারী-বেড়ালে সামনে নেংটি ইঁদুর। ই তল্লাটে জগাকে না চেনে এমুন মানুষ নাই। বটুকবাবু জোরদার মানুষ। জমি-জিরেত, ক্ষেত-খামার, পুকুর-ভেড়ি, অগাদ সম্পত্তির মালিক। গেরামের মোড়ল। নেতা মানুষ। চেলা-চামচা নিয়ে সর্বদা চলাফেরা করে। জগা সেই বটুকবাবুর চামচে। তার ওপর বটুকবাবুর ছেলে হাবলুর সাগরেত। হাবলুর চোখে রঙ ধরেছে। সে কুসুমের পেছু ছোক ছোক করছে। হাবলুর স্বভাব চরিত্তিরের কথা সবাই জানে। যে মেয়ের দিকে একবার চোখ ফেলবে তার সব্বনাশ করে ছাড়বে। কুসুম মাঠে কাজ করতে করতে ইসব কথা হারুকে বলেছিল বটে। এখুন বুঝতে পারছে হারু। সত্যি কুসুম বিপদের মুখে। হাবলু আর জগা নিচ্চয় কুসুমকে জ্বালাচ্ছে। দেনার দায়ে বটুকবাবুর কাছে কুসুমদের ভিটে-মাটি বাঁধা পড়েছে। কুসুমকে পাবার লোভে এখুন সেই দেনার ভয় দেখিয়ে কুসুমের বুড়ো বাপটাকে শাসাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাড়ি চড়াও করে ঝামেলাও করছে। এত সব কথা মনে পড়ে গেল হারুর। জগার মাথায় বাবরি। গালে জুলপি। লালচে বড় বড় চোখ। ঘাড়-গরদানে গোয়াতু'মি। যেন

এখুনি হারুকে পুরুষ্টু দুই হাতের ফাঁকে জাপটে ধরে এক ঝাপটা মারবে। কিছুই ভেবে কিনারা করতে পারে না হারু। সে দারুণ অসহায়ের মত জগার ধূর্ত শেয়ালপনা চোখ মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

: কি হে চাঁদ, কলির কেষ্ট। খুব যে মজা লুটছ। কুসুমকে লিয়ে মাঠে ঘাটে ফুর্তি মারছ। এতক্ষণে হাবলু হারুর সামনে এসে দাঁড়াল। হাবলুর চোখে রোদ ঠেকান চশমা। গায়ে রচ-বেরঙের চিত্তির বিচিত্তির হাউই সার্ট্। পরনে ঢোলাঢালা বেল্‌বটস। হারু হা করে বোকার মত ওদের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

চোখ থেকে গগল্‌স্‌টা খুলে হাবলু হারুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল : হ্যারে হারু তুকে তো ভাল মুনিষ বলেই জানতুম। জমি-জমা চাষ-আবাদ নিয়েই থাকতিস। তবে ইসব কথা কি শুনছি। বে করবি ভাল কথা। তাই বলে কুসুমকে ক্যানে। গেরামে তো আরো ঢেক মেয়ে আছে। ভাল চাস্ তো কুসুমকে ছড়িন্ দে। নচেত—জগা সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টি পাকিয়ে একখানা হাত হারুর নাকের সামনে উঁচিয়ে ধার বলে : পেদিয়ে বেন্দাবন পাঠিন দুব বুইঝেছ চাঁদ।

হাবলু শেষবারের মত গলার স্বর ভারি করে বলল : আবার যেন কুসুমকে তুর সাথে দেখতে না পাই শালা। কথাগুলো বলেই হাবলু চোখে চশমা তুলল।

পিঁটুলি গাছটার গোড়ায় বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারু। মাঠে মাঠে ধান কাটার কাজ শেষ। ধান গাছের গোড়াগুলো হতশ্রী চেহারা নিয়ে নিঃস্ব হয়ে মাঠের মাঝে পড়ে আছে। কারা যেন মাঠের সম্পত্তি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ধান খোটা পাখিরা আর মাঠের মাঝে ভিড় জমায় না। চতুর্দিকে সবুজেরা যেন সবুজ ছড়ায় না।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল কুসুমের সঙ্গে। হারুকে দেখেই কুসুম তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল জোর কদমে। ব্যাপারখানা কি। হারু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে-ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

কুসুমের সামনাসামনি পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ে।—কে গো? কুসুম? তুমি ইদিকে কুথায় যেচ্ছ?

: সে কতা তুমার জানবার দরকার নাই। তুমি ইখান থিকে পালাও এখুনি। কুসুম ইদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে গলা নামিয়ে বলল।

: অত ভয় পাচ্ছ ক্যানে। হারু কুসুমকে ভরসা দেয়।

: ভয়, আমার লেগে নয়। তুমার লেগে। আমার সাথে তুমায় দেখলে ওরা তুমায় মেরে ফেলবে গো। কুসুমের চোখের পাতা ভিজে ভিজে ঠেকে।

হারু ঠিক দেখতে পায় কুসুমের চোখে এক অমুঙ্গুলে ভয়ের ছায়া। সে আবাব অভয় দিয়ে বলে: অমন ভয় করতে লাই। বিপদকালে বুকে সাহস রাখতে হয়।

: কিন্তুক ভাবনা তো তুমার লিগে। তবু কুসুম দিশাহারা।

: ঠিক আছে, আমার ভাবনা আমি ভাবব। তুমার কুনো ভয় নাই। এখুন এই সাত সকালে কুথায় যেচ্ছ শুনি।

: আবার যাব কুথায়। আর ই গাঁয়ে থাকতে দিবেক নাই। ওরা বড় পিছু লাগছেক। তুমাকেও ওরা ছাড়বেক নাই। মোর আশা ছাড়িন দাও।

: ই কথাটাই বুলবার লিগে ঘর থিকে বেরুলে।

: হ্যাঁ, বড় দুঃখু চাপা এই বুকে। তুমারে আমি কি করিন বুঝাই।

: জানি, আমি সব জানি। সব বুঝি কুসুম। তুমাকে যে আমিও —হারুর কথা শেষ হল না। সে-ও কুসুমকে ভালবাসে। সেই কথাটা এই মুহূর্তে হারুর আর বলা হল না। ঠিক তখনই ওই বড় সড়কে যেন কারা আসছে। সুমুখে দূর দৃষ্টিতে তাকালে চোখে পড়ে। হারু কুসুম দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে দেখল।

: যাই ঘর যাই। তুমি সাবধানে পালাও। কারা যেন ইদিকে

আইসচে গো। কুসুম তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল।

কিছুদিন বাদে হারুর কানে খবর এল—কুসুম ই গাঁয়ে নাই। ভিন গাঁয়ের এক বুড়ো দু'জ বরের সাথে তার বে হয়ে গেছে। কুসুমের এক জ্ঞাতি খুড়ো নাকি এ-সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কইরে মেয়েটাকে বুড়োর কাছে কইতে গেলে বেঁচে দিছেক। সোমত্ত মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাতে হবেক তো।

'রাতারাতি কুসুমকে কুথায় সরিন ফেলিছ'। এই ছুতোতে হাবলু জগার হাতে কুসুমের বুড়ো বাপটা দারুণ ভোগান্তি ভুগেছেক। কিন্তু কুসুমের বুড়ো বাপ মেয়ের সুখের লেগে সব কষ্ট মুখ বুজে সইছেক। তবে শেষটায় বুড়োটা মরে গিয়ে বেঁইচেছেক।

এতসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে হারুর চোখে ঘুম নেমে এল। সে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে—সুমুখে সোনা রঙ ধান-জমি। সেই সিধারে শেষ সীমানায় লজর ঠেক খায় না।

গোটা ক্ষেতখানা পাকা ধান ছড়িয়ে হাসছে। পাকা ধানের শিষগুলো বাতাসে দুলে দুলে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হারুর হাতে কাস্তে। পাশে কুসুম। তার হাতেও কাস্তে। ওরা দু'জনেই মাঠ বরাবর মুখ করে চেয়ে আছে। দু'জনের চোখেই টলটলে খুশির ঢেউ উছলে পড়ছে। কুসুমের মুখের কাছে মুখ এনে হারু বলল: কি গো কুসুম, মনে পড়িছেক তুকে বুলেছিলাম না। একদিন মোর নিজের জমি হবেক।

: কি কইছ গো, ই গোটা জমিটাই তুমার ?

: হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আর পরের জমিতে কাম করব নাই।

: অবাক কাণ্ড, ই কথা শুনে মোর বিশ্বাস হচ্ছেক্ নাই।

: হুঁ, হুঁ, খাটতে হয় রে খাটতে হয়। খাটুয়ে মুনিষের অসাধ্যি কিছুই নাই। হারু কথাটা যেন গর্বের সঙ্গে বলে ফেলল।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইটা ঠিক কথা। হেই ঠাকুর। কুসুম মাথায় ঘোমটা

তুলে পূব মুখো আকাশপানে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

: নে, নে। কপাল ঠুকতে হবেক নাই। আর দেরি সয়। মাঠে নামতে হবেক এখুনি। হারু তাড়াতাড়ি করতে থাকে। তার হাতে অনেক কাজ। অযথা সময় নষ্ট করার মানুষ সে নয়। কুসুম সে কথা ভাল করেই জানে।

ওরা ছু'জনেই মাঠে নামল। ধানের গোছা কাটতে লাগল। হারুর পাশে কুসুমও কাস্তে মেরে ফসল কেটে জমিতে শুইয়ে রাখতে রাখতে মিটি মিটি হাসতে থাকল। কুসুমের এমন খলখলে খুশি ভাব দেখে হারু বলল: আর মোদের কুনো ছুঃখু থাকবেক নাই। মোরা ইবারে ঘর বাঁধব। কথাটা শেষ করেই হারু কুসুমকে ধরে আদর করতে লাগল।

এমনি সময় হারুর ঘুম ভেঙে গেল—মা গলা চড়িয়ে ডাকছে: হ্যাঁরে, হারু, উঠ্ বাপ্। বেলা যে ঢেক বেড়েছেক। মাঠে যাবিক নাই?

জ্বালা

ভোর সকালে উঠে পড়েছিল সানু। বিশেষ একটা কাজে বেরোতে হবে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে সে বাঁশের আড়ায় ঝোলান জামাটা টেনে নিল। টালির ছাউনি বাঁশের খুটির ঘর। চাচের বেড়ায় ঝোলান সস্তা দামের আয়নায় মুখটা দেখল—সারা রাত ঘুম হয়নি। হাজার রকম দুঃশ্চিন্তায় দোমড়ান মোচড়ান মন। বসে যাওয়া চোখের কোলে কালি। চোয়াড়ে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অবিন্যস্ত ঝাকড়া মাথার চুল। এক বিধ্বস্ত, বিধ্বংসী চেহারা। সানুর মানসিক জগতে একটা অশান্ত ঝড় বয়ে চলেছে।

ঘরের আড়ায় মাকড়শার জাল। ঝুল কালি জড়ান পোটলা পুটলি পাটাতনে অযত্নে রাখা জং ধরা পোটমান। সুটকেস্। হাঁড়ি। কলসি। মা-মনসার মুখ আঁকা ঘট ঝুলছে।

তক্তপোষের ওপর পুরোনো মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা পাতা। তেল চিটচিটে মাথার বালিশ। মা দলা পাকিয়ে অসহায়ের মত শুয়ে কোকাচ্ছে। মাথার ওপর চাচের বেড়ায় গোঁজা কালীঘাটের মাকালীর পট। ছেঁড়া। ধুলো বালির আঁশ জড়ানো। সানু একবার তাকিয়েছিল সেই মাকালীর ছবিটার দিকে। কিন্তু কোন ভক্তি অথবা বিশ্বাসের উদয় হল না। বরং বিরক্তি বোধটাই জেগে উঠেছিল বেশী পরিমাণে। ছোটবেলা থেকেই সানু দেব দেবীর কুসংস্কারকে প্রতিবাদ করত। এসব কুসংস্কার সংগ্রামের পথে মানুষকে দুর্বল করে দেয়। মুহূর্তে সানু মাকালীর ছবিটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। একটা শক্ত সংযমের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইল। পরক্ষণেই আবার তাকাল মায়ের বিছানার দিকে। ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা দলা

পাকিয়ে মায়ের বিছানার পাশে অবহেলায় পড়ে আছে। সান্নু সেই দলা পাকান কাগজটা হাতে করে তুলে নিল।

মা অম্বলের ব্যথায় পেট খিচে ছট্‌ফট্ করছে। হাড় জির জিরে বুড়ো শরীরটা চি-চি করে কোকাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে: গ্যাসট্রিক আলসার। অপারেশন করতে হবে। পরশুদিন হাসপাতালে আউট ডোরে লাইন দিয়ে ডাক্তার দেখান হয়েছিল। ওষুধ লিখে দিয়েছে ডাক্তার। দামী ওষুধ। বাইরে থেকে কিনতে হবে। হাসপাতালে পাওয়া যাবে না। বেড খালি নেই। এখন রোগী ভর্ত্তি করা সম্ভব নয়।

চৌ-কাঠ ডিঙিয়ে বেরোবার মুখে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সান্নু। ছোট ভাই বোন দুটো শুকনো মুখে পোষা বেড়ালের মত মাথা গুঁজে ঠোঙা তৈরী করছিল। মা অসুস্থ বলে এ দায়িত্বটা ওদের ঘাড়ে পড়েছে।

দিদি টিউশানি করতে গেছে। আর ফেরেনি। মজুমদার বাড়ির বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পড়ায়। একসঙ্গে চারটে বাচ্চা পড়িয়ে মাসে পঁচিশ টাকা পায়। সেই সঙ্গে সকালের টিফিন আছে। সেই ফাউ টিফিনের লোভেই দিদিটা রোজ সকালে উঠেই পড়াতে যায়। গেল বছর মাধ্যমিক পাশ করেছে দিদি। চাকরির চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন আশা নেই। তবে মজুমদারেরা ভরসা দিয়েছে—বড়বাজারের কোন এক মাড়োয়ারী ফার্মে টাইপিষ্টের চাকরি হবে। সে জন্যে দিদির টাইপ শিখতে হবে। মজুমদারের বড় ছেলে নাকি টাইপ কলেজে ভর্ত্তি করে দেবে। যাক, তবু যদি দিদিটার একটা হিল্লে হয়ে যায়। সান্নুর খানিকটা দুঃশ্চিন্তা কমে। সোমত্ত মেয়ে। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ দু'দিন হয়ে গেল দিদি বাড়ি ফিরল না। সান্নুর মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে।

দেশ ভাগের পর এদেশে এসে ক্যাম্পেই কেটে গেছে বিশ বছর। সান্নুরা তো ক্যাম্পেই জন্মেছে। সেখানকার স্যাত স্যাতে জল বাতাস। আর ঘোলাটে আকাশের তলায় ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে শত শত

মানুষ। ছিন্নমূল পরিবার। সব অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে প্রাণান্ত। ঝাক্ ঝাক্ অভিশপ্ত মানুষের আর্ত হাহাকার। অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যত। সেই পাক-পঙ্কিলময় আবর্তের মধ্যে ক্যাশ ডোল। খিচুড়ি। আর ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে কেটে গেছে বছরের পর বছর।

সানুরা দিনে দিনে বড় হয়ে উঠেছিল সেই পরিবেশের মধ্যে। তবুও সেই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে শিক্ষার আলোক স্পর্শে উদ্দীপ্ত হতে চেয়েছিল ওরা। সানুর বাবা ভর্তি করে দিয়েছিল সানুকে আর তার দিদিকে সেই ক্যাম্পের ইস্কুলে।

অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে সানুর বাবা একটা চাকরি জুটিয়েছিল। জুটমিলে।

পরে ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে সানুরা উঠে এসেছিল কলোনীতে। সরকারী সাহায্যে মাথা গুঁজেছিল একফালি জমিতে। শ্যামনগর "সুকান্ত কলোনীর' বাসিন্দা সানুরা।

টালির ঘর। সামনে একফালি উঠোন। তুলসি-মঞ্চ। চালে লাউ মাচা। ঘরের পেছনে মানকচু। কলাগাছের ঝাড়। পেয়ারা তলায় ছাগল ঘর। এসব নিয়ে সংসার পেতেছিল সানুর বাবা।

চটকলে চাকরি করে কোনরকমে সংসার চালিয়ে নিচ্ছিল সানুর বাবা। কিন্তু দিন রাত মাল টেনে টেনে বুদ হয়ে থাকত সে। শরীর খুইয়ে শেষে একদিন হার্টফেল করে মরল মানুষটা।

মাত্র বছর দুই হল সানুর বাবা মারা গেছে। সানু তখন ক্লাশ নাইনে পড়ত। দিদি ক্লাশ টেনে। পরে দিদিটা কোন রকমে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। কিন্তু সানুর পড়া বন্ধ হল। বিধবা মা। দিদি। ছোট দুটি ভাই বোন নিয়ে সানুদের তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

তারিণীদা'র সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কাল রাতেও একবার ক্লাবে গিয়েছিল সানু। তারিণীদা'র দেখা পাওয়া গেল না। হপ্তা দুই হয়ে গেল তারিণীদা পাড়ায় নেই। থাকলেও ধরা যায় না। কখন আসে

কখন যায়, কেউ টের পায় না। সে এখন ভি, আই, পি হয়ে গেছে। সান্নু তারিণীদা'র কাছেই জানতে পেরেছিল—মলয়দা দিল্লী থেকে ফিরেছে। সান্নুকে ভরসা দিয়ে তারিণীদা বলেছিল: আমি তোর কথা মলয়দাকে বলে দিয়েছি। কিন্তু সবই ধাপ্পা। ওরা সবাই ভো-ভো। কারোর সঙ্গেই দেখা করতে পারছে না সান্নু।

আর দাঁড়াল না সান্নু। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কলোনীর সরু রাস্তা। পাশে পাশে বাড়ি ঘর উঠেছে অনেক। অনেকের অবস্থা ফিরেছে। ব্যবসা। বানিজ্য। চাকরি বাকরি করে অনেক ফ্যামিলি দাঁড়িয়ে গেছে। আগের চেয়ে কলোনীর চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সান্নুদের মত দু'পাঁচ ঘর আছে।

সান্নু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। ভোরের পাঁচটা সাঁইত্রিশের ডাউন লোকালটা ধরতেই হবে। হাতে ঘড়ি নেই। তবু আন্দাজে বোঝা যায় পাঁচটার বেশী বাজেনি। পাড়ার ফেলুদা'র চায়ের দোকানে সবে উনুনে কেট্‌লি ফুটছে। দু'একজন কলোনীবাসী বুড়ো ইতিমধ্যে এসে জুটেছে। আকাশ পরিষ্কার। বাঁশ ঝাড়ের সরু সরু পাতা দুলছে! সজনে গাছের ডালে কাক বসেছে। একটা নেড়ী কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সান্নুকে সাঁই সাঁই করে হাঁটতে দেখে ফেলুদা গলা খেঁকারি দিয়ে ডাকল: আরে সান্নু। এত সকাল সকাল যাইতেছ কই ?

: কলকাতা যেতে হবে। সান্নু দারুণ অনিচ্ছায় দাঁড়াল।

ফেলুদা বিড়ি টানতে টানতে কেশে উঠল। গলার স্বর ভাঙা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সে পঁয়ষট্টির বার্দ্ধক্য। অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করা ভাঙচুর চেহারা। মাথায় টাক। চোয়াল ফোক্‌লা। বিড়ি টানতে মাড়ি ওঠানামা করে। গলার কণ্ঠনালী কাঁপে। : গাড়ির দেরী আছে। অত দৌড়াও ক্যান।

: তা জানি। সান্নু এগিয়ে এল। তিনপায়া ভাঙা টেবিলটা যেটাতে চা বানান হয়। চায়ের ছাবা। গাঁদ। পোড়া গুলের ছাই

একগাদা নোংরা আবর্জনার স্তূপ দোকানের সামনে জড় করা। মাছি ভ্যান ভ্যান। ঘেয়ো নেড়ী কুকুর এসব ডিঙিয়ে সানু দু' এক পা করে এগিয়ে এসে ফেলুদা'র চায়ের দোকানে ঢুকল। : বসব না ফেলুদা। তাড়াতাড়ি এক কাপ চা দাও। আর থাকে তো এক মুঠো মুড়ি। সকাল বেলা খালি পেটে চা খাওয়া ঠিক নয়।

পাশেই ছিল মদন খুড়ো। বাহাত্তুরে। চোখে ছানি, কথা বলতে গেলে হাঁপায়। সে সানুর তাড়া দেখে ফেলুকে বলে : হ। ছ্যামড়ার সময় নাই, অরে তড়াতড়ি দেও ফেলু। হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়োটা সানুর দিকে ঘোলাটে চোখে তাকায়। অসহায় করুণ চাউনি।

সানুর মায়া হয়। বুড়োটা এখনো বেঁচে আছে। সে বছর নকশাল আন্দলোনের সময় বুড়োটার জোয়ান নাতিটাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

কয়েক চুমুকে চা শেষ করে সানু উঠে দাঁড়াল। : চললাম ফেলুদা। একটা বিড়ি দাও।

বিড়িটা এগিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল : সানু। আমার কিছু পাওনা আছিল। যদি দিতে পারস। তইলে উপকার হইত। ঘরে অসুখ-বিসুখে মরতাছি। ভাঙা গলায় আবার কেশে উঠল ফেলুদা।

: আচ্ছা আমি বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করছি ফেলুদা : সানু ছুটে ষ্টেশনের দিকে গেল।

চৈত্রের দুপুর খট্‌খটে রোদ। সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে। খিদে পাচ্ছে। পেট জ্বালা করছে।

সেই সকালে ট্রেন ধরে শ্যামনগর থেকে বালিগঞ্জ এসেছে। রাস্তার ওপারে হলুদ রঙের তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে সানু। দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে। বাঁ হাতের ক্ষত স্থানটায় হাত বোলাতে থাকে দারুণ আফশোসের সঙ্গে। পকেট হাতড়ে চার ভাঁজ করা প্রেসক্রিপশনটা বার করল সানু। ভাঁজ খুলে কাগজটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। কপালের দু'পাশের শিরা ফুলে উঠল।

তুই ভুরুর মধ্যিখানে চিন্তার ছাপ পড়ল। তিন/চার রকম ওষুধ। ইনজেক্শান। এসব কিনতে বেশ কিছু টাকা দরকার এখুনি।

অনেকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকার পর সানু কাঁচা খিস্তি মারে, শালা। শুয়োরের বাচ্চা। রক্তবর্ণ চোখ দুটো দপ্ দপ্ করতে থাকে সানুর।

সকাল থেকে সানু এখানে ঘোরাঘুরি করছে। কিছু টাকা চাই। মাকে বাঁচাতে হবে। পেটের ব্যথায় মা দারুণ কষ্ট পাচ্ছে। এত কষ্ট ছেলে হয়ে চোখে দেখা যায় না। সানু এখন বাচ্চা ছেলে নয়। সে বড় হয়েছে। সংসারটা এখন তার একার ঘাড়ে। তিন দিন হয়ে গেল দিদিটার পাত্তা নেই। সেদিন সকালে টিউশানিতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। শোনা যাচ্ছে, পাড়ার মজুমদার বাড়ির বড় ছেলেটার সঙ্গে পালিয়েছে। এত সব ঝামেলার মধ্যে আবার একটা উটকো ঝামেলা।

অসুখে ভুগে ভুগে মা চেচাচ্ছে : মাইয়াডা যে গেল কই। আইজ তিন দিন হইয়া গেছে। কোন খোঁজ নাই। বয়স্থা মাইয়া। কী সব্বনাইশ্যা কাণ্ড ঘটাইব কেডা জানে। সানুডা কী পাষাণ পোলা। দিদিডার লইগ্যা মোডেই মায়া নাই। এট্টুও খোঁজ-খবর যদি লইত। কী যে করুম। আমি তো মরতে পড়ছি আমার পোড়া কপালে যে কী আছে কেডা কইব।

মায়ের আর্তস্বরের কান্না সানুর মনটা দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছিল। দিদির জন্যে মনটা টাটিয়ে ওঠে ঠিকই। কিন্তু এতবড় সংসারের ঘানি টানতে টানতে সানু এখন দিশেহারা। অভাব অনটনের জ্বালায় দিনের পর দিন কেমন যেন নির্দয়, নির্মম হয়ে উঠেছে সানু। তবু মায়ের জন্যে সানুর মনটা নরম হয়। রোগ-যন্ত্রণা। শোক। তাপে মা উতলা হয়ে পড়েছে। অসহ্য জ্বালায় দিন রাত চেচাচ্ছে। সানু আর সহ্য করতে পারে না। কেমন করে এ সংসারটাকে সামাল দেবে। কেমন করে মাকে রোগ-মুক্ত করে তুলবে।

এখন প্রায় দুটো বাজে। মাথার ওপর শুকনো আকাশ। জ্বলন্ত সূর্যের নীচে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সানু। খিদে পেয়েছে বার তিনেক কলের জল খেয়েছে। পকেট হাতিয়ে দশটা পয়সা পেয়েছিল। তাতে যে কটা বিড়ি পেয়েছিল—এতক্ষণ তাই দিয়ে চলল। মুখটা তেতো লাগছে। থুতু উঠছে। পেট মোচড়াচ্ছে। সানু এখন কী করবে? আবার সে তাকায় রাস্তার ওপারে। সেই হলুদ বাড়িটার দিকে। কিন্তু কিচ্ছু করবার নেই। শুধু ফাঁকা মাঠে ক্রুদ্ধ ঘোড় সওয়ারের মত ছুটোছুটি করছে।

এই তো মাস ছ'য়েক হল। হাসপাতাল থেকে ফিরেছে সানু। শরীরের প্রায় পাঁচ/সাত জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। অনেক কষ্টে প্রাণে বেঁচে গেছে সানু। ইলেকশানের কিছুদিন আগে ওপাড়ায় পোষ্টার লাগান নিয়ে একচোট হয়ে গেল। ভবানীলালের ছেলেদের সঙ্গে সানু সেদিন বাংলা টেনে পুরোপুরি আউট হয়েছিল। প্রচণ্ড পিটিয়েছিল ওদের একটাকে। ওদের পোষ্টারগুলো ছিঁড়ে দিয়েছিল দেওয়াল থেকে। সানু জানত ওরাও সুযোগ পেলে ছাড়বে না। বাগে পেলে লাশ নামিয়ে দেবে।

তবে সেইদিনই যে ওরা সানুকে ওভাবে ঘিরে ফেলবে ঠিক ভাবতে পারেনি সানু।

সেদিন সংসারে কিছু টাকার দরকার ছিল। রেশন, বাজার, মুদি। মাসের শেষ। সংসারে একটা পয়সা নেই। মায়ের খ্যাচ-খ্যাচানি। দিদির অভিযোগ। ছোট ভাই বোনদের অভিমান। একটা জ্বলন্ত দীর্ঘশ্বাসের সংসার।

পোষ্টার লিখে আর মলয় মুখার্জির দলে কাজকম্ম করে তখন দিনে পাঁচ/ছ' টাকা পেত সানু।

সেদিনও ক্লাব ঘরে বসে পোষ্টার লিখছিল সানু। অন্যান্য কর্মীরাও ছিল। দ্বিজু। ভানু। রামু। বলরাম। ছেলে ছোকরার দল সবাই ভোটের জন্যে খাটছে।

তারিণীদা স্থানীয় পার্টি নেতা। সে জোগার করেছে সবাইকে। মলয় মুখার্জির হয়ে ইলেকশানে খাটবার জন্যে।

ঘরের কোণে অযত্নে স্তূপাকৃত পোষ্টার। লিফলেট। ফেষ্টুন। দেওয়ালের পাশে একটা কাঁচভাঙা বড় আলমারীর মাথায় মাকড়শার জাল। ধুলো বালি। কালি ঝুলি জড়ান। আলমারীর তাকে রঙের খুরি। হাতে বানান তুলি। হাতল ভাঙা চায়ের কাপ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের একপাশে একটা টেবিল। হাতল ভাঙা চেয়ার। একখানা টুল। কড়িকাঠে ঝোলান একটা মান্ধাতা আমলের সিলিং ফ্যান। ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরতে থাকে। বাতাস লাগে না মোটেই। মাটিতে মেঝের ওপর কাগজ রঙ তুলির ছড়াছড়ি। পোষ্টার লেখা চলছে—মলয় মুখার্জিকে ভোট দিন। দরদী সমাজ সেবক অক্লান্ত কর্মী মলয় মুখার্জিকে ভোট দিন।

সানুকে একমনে পোষ্টার লিখতে দেখে দ্বিজু সুর টেনে বলল: কিরে সানু। খুব যে খাটছিস। পকেটে কিছু পড়েছে তো ?

একবার মুখ তুলে তাকাল সানু। কিন্তু কিছু বলল না। সে আবার তুলিতে টান মারতে লাগল।

বিড়ির গোড়ায় শেষ টান দিয়ে বাকিটুকু সানুর দিকে এগিয়ে ধরে দ্বিজু আবার বলল: আমি নগদনারান না পেলে এক পা নড়ছি না। দ্বিজু থামতেই ভানু উঠে দাঁড়াল। সে এতক্ষণ টুলে বসে খবরের কাগজটা দেখছিল। তারপর সানুর কাছে এগিয়ে এসে বলল: তা আমরা তোমায় চিনি হে। তুমি একটি মাল। সানু এবারেও মুখ তুলে ভানুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

পোষ্টার গোছাতে গোছাতে রামু বলল: কেন ওকে যা তা বলছিস ভানু। দ্বিজু ঠিকই বলেছে। আমরা সবাই বেকার। হাত খরচ না পেলে আমাদের চলবে কি করে ? এ কি শালা আমাদের শ্রাদ্ধ না বাপের পিণ্ডি ?

এবারে সানু মুখ খুলল: ঠিক, ঠিক, ঠিক, বলেছিস রামু। শালা

পার্টির টাকা মুফতে আসে। আমরা নেব না কেন। আমাদের নাম করে যারা বস্তা লুটছে তাদের দেখছে কে। আমরা তবু জান দিয়ে খেটে পয়সা নিচ্ছি।

সান্নুর কথা থামার সঙ্গে সঙ্গেই তারিণীদা এসে ক্লাব ঘরে ঢুকল। পা-জামা-পাঞ্জাবী পরা চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পাতলা লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় ঘন চুলের পাশে জুলপি সাদা। বছর পঞ্চাশের নীচে বয়স। একনজরে দেখলে নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিদীপ্ত বলে সহজেই মনে হবে।

তারিণীদাকে দেখে সবাই চুপ। সম্ভ্রমে কি ভয়ে অথবা স্বার্থ সিদ্ধির আশায় বোঝা মুস্কিল।

কাজকম্ম কেমন চলছে। তারিণীদা সিগারেটে দেশলাই কাঠি ছোয়ান শেষ করে সবাইকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

: ভাল। তারিণীদা। সান্নুই প্রথম উত্তর দিল।

: কিরে, সান্নু। তোর কাজ শেষ হল? তারিণীদা একবার ক্লাব ঘরের চারদিকটা দেখে নিল।

: হ্যাঁ। তারিণীদা। সান্নু গদ গদ গলায় বলল।

: তাহলে পোষ্টারগুলো আজই রাস্তায় রাস্তায় লাগিয়ে দিতে হবে। তারিণীদা যেন খুশি মনেই সান্নুর দিকে তাকিয়ে বলছিল।

সান্নু লক্ষ্য করল তারিণীদাকে আজ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। হয়ত মালকড়ি পকেটে পড়েছে। এই সুযোগে কথাটা পেরে দেখলে কেমন হয়। তাছাড়া আজ সবাই আছে।

পোষ্টার লিখতে লিখতে সান্নু এক ফাঁকে তারিণীদাকে জিজ্ঞেস করল: চাকরি পাব তো তারিণীদা।

: পাবি রে পাবি। হাসতে হাসতে তারিণীদা সান্নুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবার বলল: মলয়দা জিতলে আমাদের এই কনস্টিট্যুয়েন্সিতে কোন ছেলে বেকার থাকবে না। তবে সান্নু তোর ওপর ওদের খুব খার আছে রে। তুই একটু সাবধানে থাকবি।

হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে তারিণীদা সানুকে সাবধান করে দিল। তারপর প্যাকেট ভেঙে সিগারেট বার করে ধরিয়ে টানতে লাগল।

সানু একসময় বশংবদের মত তারিণীদা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচু গলায় ফিস ফিস করল।

তারিণীদা সানুর দিকে এমন করে তাকাল যেন একটা পোষা কুকুরকে চুক চুক করে আদর করছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলল: এই নে। আজ এই পনেরোটা টাকা রেখে দে। পরে দেখব'খন। কিছু ভাবিস না। আমি আছি।

একগাদা আশা ভরসা। আদেশ। নির্দেশ দিয়ে তারিণীদা চলে গেল। সে এখন দারুণ ব্যস্ত মানুষ।

টাকা পেয়ে সানু বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। রেশনটা ধরতে হবে। নইলে সংসারে মুখ দেখান যাবে না।

কিন্তু হঠাৎ পাঁচ/ছ' জন ঘিরে ফেলল সানুকে। এত আচমকা ওরা ঝাপিয়ে পড়ল যে, সানু কোমরের ছুরিটাও বার করবার সময় পেল না। যে ছেলেটাকে সেদিন বে-ধরক পিটিয়েছিল সানু। সেই মার খাওয়া ছেলেটারই গলা শোনা গেল: সেদিন শালা এরিয়ায় পেয়ে খুব রং লিয়েছিলে। আজ চাঁদু তোমায় মায়ের ভোগে পাঠাব। পেটের দিকেই তাক ছিল ওদের। সানু প্রাণপণে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। পেট বাঁচলেও বাঁ হাতটা দারুণ জখম হল। শরীরের আরো পাঁচ/ছ' জায়গায় আঘাত লেগেছিল।

সানুকে দেখতে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিল তারিণীদা'র দল। সানুকে সহানুভূতির সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছিল: কিছু ভাবিস না সানু। আমরা আছি। মলয়দাকে সব জানান হয়েছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ একটা জরুরী মিটিং রয়েছে বলে আসতে পারলেন না। তবে মলয়দা বলেছেন: যত টাকা লাগে দেবেন। তোকে ভাল করে তুলতেই হবে।

সানু জানে তার ওপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদে পরদিনই একটা

মিছিল বার করা হবে। তারিণীদা মলয় মুখার্জিকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাবে। নিজের প্রচার ভালই জমবে। জমেওছিল।

সভা জমেছিল। মলয় মুখার্জি বক্তৃতা করেছিলেন : বন্ধুগণ। ঈশ্বরের কৃপায় আর আপনাদের শুভেচ্ছায় কোনরকমে আমি বেঁচে গেলেও আমার নিরীহ কর্মী বন্ধুটি সেই বর্বর আক্রমণের শিকার হয়েছে। বড়ই অনুতাপের কথা এই যে, আমায় বাঁচাতে গিয়ে সেই তরুণ যুবকটি আজ মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে রয়েছে।

দুর্ঘটনার কয়েকদিন পরেই ইলেকশান। সানুর ওপর আক্রমণের ঘটনা দারুণ ভাবেই সাহায্য করেছিল মলয় মুখার্জিকে।

বাঁ হাতের দিকে আবার তাকায় সানু। হাতটা যেন অবশ, অসাড়। আগের মত আর জোর পাওয়া যায় না। দাঁতে দাঁত ঘসে সানু। আমার জখমটা দিয়েই বাজি মাত করেছিল শালা। একবার বাগে পেলে হয়। নেতাগিরি ছুটিয়ে দেব। শালা ধাপ্পাবাজ কোথাকার। ভোটে জিতে অবধি বাবুদের পাত্তা নেই হপ্তাদুইর বেশী হয়ে গেল। তারিণীদা'র খবর নেই। যেন পালিয়ে বেড়ানর চেষ্টা। শালা ধরা পড়লেই ভেজা বেড়ালের মত মিউ, মিউ, করতে থাকে।

একদম সময় পাচ্ছি না রে। দারুণ ব্যস্ত আছি বুঝলি। তোদের কথা আমার মনে আছে সানু। মলয়দা দিল্লী থেকে ফিরলেই তোদের জন্যে যা হোক একটা কিছু—এসব মন ভেজান কথা অনেক শুনেছে সানু। আর শুনতে চায় না। তাই অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। সেদিন ক্লাব ঘরে তারিণীদা'র মুখের সামনে মুখ তুলে সানু উত্তেজিত হয়ে বলেছিল : আপনার সঙ্গে খুব দরকারী কথা আছে তারিণীদা।

: বুঝেছি। সব বুঝেছি সানু। তারিণীদা সবজান্তার মত মাথা নাড়াল। আবার আশ্বাস দিয়ে বলল : মলয়দা দিল্লী থেকে ফেরেননি।

সেসন শেষ হয়নি। আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তুই একদিন আমার বাড়িতে আসতে পারিস। তোর কথা আমি সব সময় মলয়দাকে মনে করিয়ে দেই। সেজন্যে তুই ভাবিস না।

: আমি আর দেরী করতে পারছি না। আমার সব খবর যদি আপনি জানতেন তারিণীদা। সানু যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। : আপনি বলেছিলেন ইলেকশানটা হয়ে গেলেই।—

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলাম। তারিণীদা ভগবান-মার্কা মুখে সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ধীর গলায় বলল : মনে আছে রে মনে আছে, সব মনে আছে। আসল ব্যাপারটা কী জানিস। তোদের থেকেও অনেক বেশী লেখাপড়া জানা ছেলেরা সব আসছে চাকরির জন্যে। তোরা যদি গ্রাজুয়েট হতিস।

সানুর বলতে ইচ্ছে হল—কিন্তু মুখে না বলে মনে মনে বলল : আপনার মলয় মুখার্জিকে জেতাতে গিয়ে আমার জীবনটাই বাজি রেখেছিলাম। আর আজ আপনারা বলছেন—এবারে সত্যিই মুখ খুলল সানু : তার মানে আমাদের চাকরি হবে না। সানুর গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ ফুটে ওঠে। তারিণীদা ঢোক গিলল : ঠিক তা বলছি না। একটু অপেক্ষা করতে হবে। সরকারকে সুযোগ দিতে হবে, আনএমপ্লয়েমেন্ট প্রবলেম নিয়ে খুবই চিন্তা করছে সরকার।

: রাখুন আপনাদের সরকার। সানু দারুণ উত্তেজিত হয়ে দাঁত ঘসতে থাকে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। আপনি মলয় মুখার্জির দোহাই দিয়ে ইলেকশানের আগে কী বলেছিলেন ?

: আবার উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ? তারিণীদা নরম গলায় বলল : তোরা ইলেকশানে এত খেটেছিস। এত করেছিস। তোদের কি ভুলতে পারি।

: পিয়াজী ছেড়ে সোজা কথা বলুন। চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা ছিল। কেন হচ্ছে না ? আপনারা আমাদের এভাবে ব্যবহার করে সুযোগ মত ছুঁড়ে ফেলে দেবেন তা চলতে পারে না। সানুর খনখনে

গলার আওয়াজ আছড়ে পড়ে।

তারিণীদা'র ভুরু কুঁচকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে যায়। তারপর আগের মত সহজ গলায় বলল: দেখ সান্নু তোর নামে পুলিশ রিপোর্ট ভাল নয়।

: সে কার জন্যে ?

: চেচাস না। অনেকক্ষণ ধরে গজরাচ্ছিস। আজ বাড়ি যা। মলয়দা দিল্লী থেকে ফিরলে সব বলব। দেখা যাক কী করতে পারি।

বালিগঞ্জের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সান্নু সেই হলুদ রঙের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। যে বাড়িটার গেটে পুলিশ পাহারা আছে।

রাস্তার অপর প্রান্তে সান্নু। মাথার ওপরে খটখটে ধূসর আকাশ। পাঁচতলা। সাততলা আধুনিক বাড়িগুলো সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদে অ্যানটেনার ডাঁটিতে দাঁড়কাক মাথা ঠুকছে। বাড়ির বাসিন্দারা নির্দয় নির্মম ভাবে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

নিচে পিচ গলা রাস্তা। মাঝে মাঝে দমকা আগুন-বাতাস। সান্নুর ভেতরের আগুনকে আরো উত্তপ্ত করছিল। রাস্তার যে কোন পথচারী সান্নুর অস্থির। উত্তেজিত। রাগী মুখখানা দেখে ভয় পাবে। একটা প্রতিহিংসার জ্বালা। যে জ্বালার আগুনে সংসারটা পুড়ছে। মা পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ছট্‌ফট্ করছে। ছোট ভাই বোন দুটো খিদের জ্বালায় ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দিদিটা বাড়ি থেকে পালিয়েছে হয়ত আর ফিরবে না।

দারুণ আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সান্নু। দু'হাতের বজ্র মুষ্টিতে নিজেকে সংযত করতে চাইছিল সে। কিন্তু অবশ বাঁ হাতটা ব্যথায় চিন চিন করতে থাকে। সেই ব্যথাটা সান্নুর সারা শরীরের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিল। উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল সে। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না।

ঝড়ের বেগে ছুটে গেল সান্নু। ওপারের সেই হলুদ রঙের বাড়িটার

সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গেটে পুলিশ।

কয়েক মুহূর্ত থমকে গেল সানু। তারপর কাউকে কিছু না বলে বেপরোয়া ভাবে সোজা ঢুকে গেল গেট পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে। গেটের পুলিশ ছুটে এল। বাধা দিল : ভেতরে যাবেন না। বলুন কী চাই।

সানু ঝাঁঝাল গলায় বলল : মলয়দার সঙ্গে দেখা করব। ছেড়ে দিন। তিনি আমায় চেনেন।

: তবু একটা নিয়ম আছে। আপনি বসুন। খবর পাঠাচ্ছি।

: অত সময় নেই। জরুরী দরকার। সানু কোন বাধা মানল না। সে সোজা চলে গেল ভিতরে।

যে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সানু। সেই ঘরটা বোধহয় বাইরের ঘর। দামী আসবাবপত্রে সাজান গোছান ঘরখানা। সোফা। আলমারী। বুকসেলফ। সেন্টার টেবিল। মাঝখানে মধ্যবয়েসী চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। ব্যাক ব্রাশ করা। চোখে পুরু লেন্সের দামী চশমা। বোধহয় ইনিই মলয় মুখার্জি। এঁকে আগে কখনো দেখেনি সানু। তারিণীদা এবং আরো দু'চারজন লোক একসঙ্গে মিলে কথাবার্তা বলছে। বোধ হয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

হঠাৎ ওদের নজর পড়ল : কে? কি চাই?

সানু উত্তর দিল না। সে নিশ্চুপ হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

: জোর করে ঢুকে পড়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। পুলিশের লোকটা পেছন থেকে বলল।

মলয় মুখার্জি অবাক! তিনি তারিণীদা'র দিকে তাকিয়ে বললেন : কীহে। তারিণী। ওকে চেন নাকি? একটা বাইরের লোক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন মলয় মুখার্জি।

: হ্যাঁ, না, মানে ওই মুখ চেনা মাত্র। তারিণী আমতা আমতা

করে বলল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সানুর দিকে তাকাল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ঃ তুই এখানে ?

সানুর জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা তারিণীর ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখে মুখে তীব্র প্রতিহিংসা। : এখানে আসবার কারণ আপনি ভাল করেই জানেন।

: মানে ? তারিণী যেন কিছু জানে না এমন ভান করল।

ঃ আপনারা যে সব ছেলেদের চাকরি দেবার জন্যে নাম লিষ্ট করেছেন, তাতে আমার নাম নেই কেন ? সানুর চোখে মুখে সোজা জিজ্ঞাসা।

তারিণী যেন কেঁপে উঠল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল ঃ কী সব বাজে কথা বলছিস। যা, যা। এখানে বিরক্ত করে বাজে সময় নষ্ট করাস না। তারিণী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ঃ আমাদের জন্যে সময় আপনাদের নেই জানি। কারণ, আমরা টাকা দিতে পারব না। যারা টাকা দিতে পারবে, তাদের জন্যে সময় আছে। চাকরিও আছে।

এবারে মলয় মুখার্জি চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে ভ্রু কুচকে সানুকে দেখতে লাগলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন : স্পর্ধা কম নয়। এসব হামলাবাজ এখানে কেন ? ওকে এখুনি তাড়াও তারিণী।

তারিণী বুঝতে পারল—মলয় মুখার্জি দারুণ রেগে গেছেন। অপমান বোধ করছেন। সানুকে এখান থেকে এক্ষুণি তাড়াতে না পারলে হয়ত একটা ঝামেলা বেধে যেতে পারে। এই ভেবে সে উঠে এল। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে মুখে অবজ্ঞা মিশিয়ে বলল ঃ কেন ঝামেলা করছিস। ভদ্রলোকের বাড়ি। অশান্তি করবার জায়গা এটা নয়।

সানুর শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। সে নি[illegible]আর সামলাতে পারছিল না। এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করছিল

সে। কিন্তু তারিণী সামনে এসে দাঁড়াতেই সান্নু খেপে গেল। আচমকা সে তারিণীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। টেনে ঝাড়ল এক ঘুসি। শালা। ঘুষখোর। দালাল। কাজের সময় কাজ বাগিয়ে নিয়ে, এখন আমাদের চেন না। চাকরি হবে না আমাদের। রাগে আরো একটা ঘুসি ঝাড়তে যেতেই সান্নু বাধা পেল। পেছন থেকে কে যেন সান্নুর ঘাড়টা চেপে ধরেছে।

মলয় মুখার্জি ততক্ষণে ফোন করতে ব্যস্ত। হ্যালো হ্যালো। লালবাজার।

সান্নু ক্রুদ্ধ চোখে মলয় মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বলল: আপনি মন্ত্রী হয়েছেন। এখন আমাকে চেনেন না। একদিন আপনাকে ভোটে জেতাবার জন্যেই আমার জীবনটা বাজী রেখেছিলাম।

: সাট্‌আপ্‌। এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। মলয় মুখার্জি হুংকার দিয়ে ওঠেন।

এবারে সবাই সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। : বাপরে বাপ ডাকাত।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। পরক্ষণেই সান্নুকে জামার কলার ধরে জোর করে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

এতক্ষণে তারিণী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীত কণ্ঠে বলল: খুন। আমায় খুন করতে চেয়েছিল। বাপরে বাপ। বড্ড জোর প্রাণে বেঁচে গেছি।

পুলিশের লোকেরা সান্নুকে অক্‌টোপাশের মত জাপটে ধরল। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সান্নুকে পুলিশের গাড়িতে টেনে তোলা হল।

নিগৃহীত সান্নু তারিণার নির্মম, নির্দয় এবং জান্তব গলার স্বরটা তখনো পুলিশের গাড়ির খাঁচার মধ্য থেকে শুনতে পাচ্ছে। শালাকে থানায় চালান করে দাও।